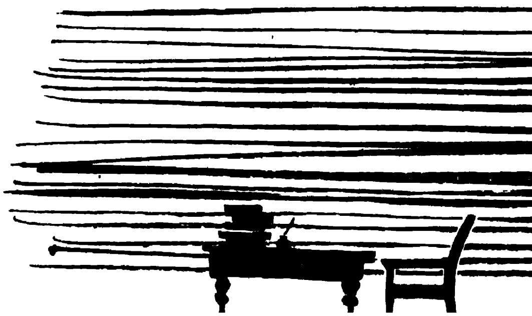


কাল নিরবধি, কিছুই দাঁড়িয়ে নেই, অভিব্যক্তির ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। কিন্তু দূরভবিষ্যতে আমি তো তখন থাকব না—আরও কত নিত্যনূতন ঘটনা আকস্মিকের রথে উড়ে চলবে। তাই শেষ কথাটির শেষ কোথায়, তা এখন কেমন করে বলি

অণুর উত্তরায়ণ

শিবতোষ মুখোপাধ্যায়

অভিজিৎ প্রকাশনী ● কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ
১৩৬৪, আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে,

প্রকাশক
অমরেন্দ্র দত্ত
অভিজিৎ প্রকাশনী
৭২-১, কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

ব্লক ও মুদ্রণ
অজিতমোহন গুপ্ত
ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও
৭২-১, কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

বেঁধেছেন
শ্রীকৃষ্ণ বাইণ্ডিং ওয়ার্কস
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ ও অঙ্গ সজ্জা
প্রতাপ দেব

পাঁচ টাকা

অণুর উত্তরায়ণ

ভূমিকা

বিশ্বব্যাপী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে নানা ঘটনার সংঘাতে সব দেশেই মানুষের মন বিজ্ঞানের নানান ব্যাপারে কৌতূহলী হয়ে উঠেছে।

এদেশেও মুখে মুখে চলেছে উড়োজাহাজের গল্প, পথে ঘাটে শুনতে পাওয়া যাচ্ছে বিকিনিতে বোমা বিস্ফোরণের খবর, আণবিক শক্তিতে চালিত সাবমেরিণের ইতিবৃত্ত, এমন আরও কত-শত কথা। পৃথিবীর পরিধি যেন অনেক ছোট হয়ে গিয়েছে। আজ তার এককোণে নতুন কোন কল্পনা জেগে উঠলে তার ঢেউ অল্পদিনের মধ্যেই দেশ বিদেশে সব জাতির মধ্যে পৌঁছে যায়।...

শুধু স্বদেশী-মালমশলা ও ঐতিহ্য-সম্পদ নিয়ে কোন দেশের মানুষই আজ সন্তুষ্ট থাকতে পারছে না। বিশ্বের রহস্য, দেশ বিদেশের খবর, বিজ্ঞান ভাণ্ডারের নবতম সঞ্চয়, এর সব কিছু জানবার জন্যে তার মন আজ উন্মুখ।

এ চাহিদা মেটাতে গেলে বিজ্ঞানীকে লিখতে হবে সরল করে, সেই ভাষায় যা সাধারণে সহজে বুঝতে পারবে। শ্রীমান শিবতোষ এ সত্য নিবিড় ভাবে উপলব্ধি করে এগিয়ে এসে কলম ধরলেন। আশ্চর্য তাঁর লেখার সারল্য, বলার মাধুর্য আর ভাবের নতুনত্ব।

১৯৫৫ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজের শতবার্ষিকী বিজ্ঞান প্রদর্শনীর আয়োজনকে কেন্দ্র করে, এই ধরণের একখানা বই লেখার পরিকল্পনা তাঁর মনের মধ্যে জেগে উঠে। কোন কোন বন্ধু তাঁকে উৎসাহ দিয়েছেন, তার ফলে আজকে এই 'অণুর উত্তরায়ণ' লেখা সম্ভব হোলো।

বাংলা দেশের শিক্ষা প্রসারের ইতিহাসের সঙ্গে যাঁর পরিচয় আছে, তিনিই জানেন, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ই আমাদের দেশে বিজ্ঞান-শিক্ষার বুনিয়াদ পাকা করে প্রতিষ্ঠিত করে ছিলেন। সারা দেশ তাঁর কাছে চিরকাল ঋণী থাকবে। তাঁরই সুযোগ্য পৌত্র আজ সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে, সৃষ্টির উষাকাল থেকে বর্তমানের মানুষ যে ধাপে গিয়ে পৌঁছেচে, তার সমস্ত পরিণতির বিরাট ইতিহাস এত অল্প কথায় অথচ সরস করে সাধারণের জানবার জন্যে সার্থক ভাবে বলেছেন। 'অণুর উত্তরায়ণ' পাঠ করে লেখকের বিজ্ঞান পরিবেশনে যে শিল্প বুদ্ধির পরিচয় পেয়েছি তাতে আমার মন এক অনির্বচনীয় আনন্দে অভিভূত হয়েছে। ভরসা হয় এ দেশেও উৎকৃষ্ট বিজ্ঞান সাহিত্য গড়ে উঠবে।

নানা দিক দিয়ে বাংলার আজ বড়ই দুর্দিন। বাংলা ভাষাই বাঙালীর প্রাণ, তারই মধ্যে নিহিত আছে বাঙালীর ঐতিহ্য ও বাঙালীর চিরকালের সম্পদ। আশা করছি শ্রীমান শিবতোষের এই পথ-নির্দেশ বাংলায় অভিনব উপায়ে বিজ্ঞান লেখার উৎসাহ-স্থল হবে। বিজ্ঞানীরা বিজ্ঞানের নানা খবর দেশের ভাষায় দেশবাসীকে এমন ভাবে পৌঁছে দেবেন ভবিষ্যৎ বাংলার সুদিন কাছে আনবার পক্ষে যা সাহায্য করবে।

এই পুস্তিকা সবার পড়ার মত, সবার ঘরে রাখার মত—এ-কথা বলতে আমার কোন দ্বিধা নেই।

৩০শে জ্যৈষ্ঠ : ১৩৬৪ — সত্যেন্দ্রনাথ বোস

কথারম্ভ

যেদিন এই পৃথিবীটা সৃষ্টি হোলো, তারপর যেদিন এই লেখাটি আমি লিখলুম—হয়তো এই বইটি আপনি পড়বেন ভেবে—এর মধ্যে কি দুস্তর সময় চলে গেছে, কত ঘটনা ঘটে গেছে, কতকিছুর আবির্ভাব-তিরোভাব হয়েছে আর কত কিছুর উত্থান-পতন হয়েছে, তার কূলকিনারা করা খুব সহজ নয়। এতো একদিন দুদিনের ব্যাপার নয়, একশো দুশো বছরেরও নয়—কোটি কোটি বছরের সব কথা। এমনি বাইরের দেখা দেখলে মনে হয়, এত সব ঘটনা নিজ নিজভাবে স্বয়ং সম্পূর্ণ; কারুর সঙ্গে কারুর কোন যোগ নেই; সব ইতস্ততঃ খণ্ডবিক্ষিপ্ত। কিন্তু ভিতরের দেখা দেখলে বোঝা যায়, এই পৃথিবীর বৈচিত্র্যের অপরিমেয় ঐশ্বর্যের মধ্যে ছড়িয়ে আছে একটা শাশ্বত মহিমা। যার ইঙ্গিত পাই অভিব্যক্তির ব্যঞ্জনায়, ক্রমবিকাশের পরিণতিতে, রূপান্তরের সমারোহে। এ বিশ্বের চিত্রকল্পরূপ, ঘটনার ফ্রেমে বিভিন্ন ষ্টিল-ছবি নয়, সম্বন্ধপরতায় আবদ্ধ একখানি সিনে-ছবি। এত ব্যাপকতার মধ্যে সমগ্রতাকে অনুভব করা যায়, এবং সেইটেই বড় কথা। বহু আগে পরমাণুরা আকাশ জুড়ে ছিল ছন্নছাড়া—তারপর তারা হাত ধরাধরি করে সৃষ্টি করল নানান রকমের অণু। পৃথিবী তৈরী হলো, ক্রমে প্রাণের আসর বসল, তাতে জীবের অভিব্যক্তি হলো, তারপরে এলো মানুষ; সুরু হোলো বুদ্ধির জয়যাত্রা। বিজ্ঞানের আসন পাতা হলো, প্রাণ-নিষ্প্রাণ দ্যুলোক-ভূলোক সম্বন্ধে ধারণা গেল বদলে, আজও মানুষের সাধনা চলেছে—তার অন্ত নেই।

নিখিল ভুবনে নিরন্তর সৃষ্টির প্রাণসাগরে, ক্রমবিকাশে-উৎসুক আমার মন-হংস, পশ্চাদপসরণ করে চলে গেছে কোন সে অতীতে; যেখানে সবের সুরু কিন্তু যার আজও শেষ নেই, সেই সমস্ত কিছুকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে ভেসে ভেসে কালের সাগর পাড়ি দিয়ে চলে এসেছে বর্তমানে। নিষ্প্রাণ জড়রাজত্ব থেকে মানসিক পরিপূর্ণতার মাঝে।

মূলতঃ এটি অভিব্যক্তির পথ পরিক্রমা—যেখানে অণুর উত্তরায়ণ হোলো চিরন্তন সত্য।

এ লেখারও সামান্য ইতিহাস আছে—যেমন সব লেখারই থাকে। ১৯৫৫ সালে, আমাদের প্রেসিডেন্সী কলেজের একশ বছর পূর্ণ হওয়ায় যে, উৎসব-আয়োজন করা হয়, তাতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ছিল বিজ্ঞান-প্রদর্শনী। এতে প্রাণিবিদ্যার যে অংশটি ছিল, সেটি আমাকে পরিকল্পনা করতে হয়েছিল—অ্যামিবা থেকে অ্যাটমের যুগ (অ্যামিবা টু অ্যাটমিক এজ)। প্রদর্শনী দেখারপর চেনা-অচেনা, অনেক বন্ধুর কাছে শুনতে পেয়েছিলুম, এটিকে ভাষায় সাজাতে পারলে আরও ভাল হয়। কিন্তু সত্যি যে এটিকে নিয়ে কখনও লিখতে বসতে হবে, সে কথা তখন ঘুণাক্ষরেও ভাবিনি। এর দুবছর পর, একদিন হঠাৎ, এই একই বিষয় নিয়ে কখন কেমন করে রাশীকৃত লেখা হয়ে গেল। কিন্তু লিখতে গিয়ে দেখি আমি যেন ছোট সাইজের এক বিশ্বপুরাণ লিখতে বসেছি! সুবিধা হোলো, পাণ্ডুলিপির অংশ বিশেষ বা সম্পূর্ণাংশ অনেককে দেখিয়ে নিতে পেরেছি। তাঁরা হলেন ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়, অধ্যাপক নির্মল বোস, ডক্টর প্রতুল রক্ষিত, ডক্টর শশাঙ্ক সরকার, ডক্টর সমর ঘোষাল, ডক্টর অজিত সাহা ও ডক্টর জ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ী। আর শ্রদ্ধেয় শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বোস ভূমিকা লিখে ওঁর কাছে কৃতজ্ঞ করে রাখলেন। বলাবাহুল্য লেখার সার্থকতা বেড়েছে সঙ্গেকার ছবিগুলির সহযোগিতায়—কারণ একখানি ছবি বহু কথা বলার সামিল। শিল্পী প্রতাপ দেব আমার মনের গভীরে যে সব টুকরো টুকরো অস্ফুট ভাবের ছায়া ছিল, তাদের তুলির আঁচড়ে আঁচড়ে কায়ায় সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন।

আমার এ লেখা রচিবাগীশ বা সিদ্ধকল্প বিজ্ঞানীদের জন্যে লেখা নয়। যাঁরা সাধারণভাবে পৃথিবী ও প্রাণ সম্বন্ধে কৌতূহলী, তাঁদের কাছেই আমার এ দরবার। বিশ্ববীণার তারে তারে আবহমানকাল ধরে অণুপরমাণুর যে ছন্দ বেজে চলেছে, তার সামান্যতম অণুরণন যদি এ লেখা পড়ে, কারুর মনে বেজে থাকে, জানব তাহলে লেখা আমার সার্থক হয়েছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিকীতে
আমার ঠাকুরদার স্মরণে

এই লেখকের

আসা যাওয়ার পথের ধারে

সূচীপত্র

অ্যাটমের খেলা

শেষ কথাটির শেষ নেই



এই পৃথিবীর রঙমহলে

ড্রপসীন উঠল

প্রায় ২৫০ কোটি বছর আগে

এমন রঙ্গ আর এমন মঞ্চ এ দুনিয়ায় আর দুটো নেই। মাত্র একখানি নাটক—তাও অসমাপ্ত—তবু তারই মধ্যে রয়েছে কি অফুরন্ত যাদুকরী! কোন বিস্মৃত কাল থেকে সুরু হয়েছে তার ঠিকানা নেই, কিন্তু আজও যে জম্‌জমাট ভাবে সবকিছু হয়ে চলেছে তার তুলনা মেলে না। এ নাটক কখনও পুরোনো হবার নয়—ধরণী এরই কোলাহলে নিত্য এত উতলা। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হল যে মানুষের তৈরী রঙমহলে কোন একটা রসঘন করুণ কাহিনী—হোক না কেন তা সেক্সপীয়ার কালিদাসের কলমের আঁচড়ে কিম্বা বার্ণার্ড শ'র টাইপ-রাইটারের ধাক্কায় প্রাণ পাওয়া—তাও কখনো একটানা বেশীদিন মঞ্চ দখল করে থাকতে পারে না। দর্শকের বিস্ময় বিমুগ্ধ মনকে আকৃষ্ট করবার জন্য চাই নিত্য নতুন রং আর রসের সন্ধান—তাই বার বার এই পালা বদলের প্রশ্ন। খাঁটী পুরোনো জিনিসকেও বেশ কিছুদিনের ছুটি দেওয়ার প্রয়োজন হয়, আবার তাকে নতুন করে ফিরে পাব বলে।

যে কোন নাটকের পক্ষে 'একশো-রাত্রি' অভিনয় হওয়া একটা দারুণ হৈ-চৈ-এর ব্যাপার। তখন সভার আয়োজন করে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের পুরস্কার বিতরণের প্রশ্ন ওঠে। কিন্তু ধরণীর রঙমহলে যে অসম্পূর্ণ নাটকটি আজও অপ্রতিহত ভাবে চলে আসছে, একশো রাত্রি ছেড়ে কোটি কোটি বছর পার হয়ে— তার খবর আমরা কজন রাখি? অথচ সে নাটকে আমরা না জেনে সবাই এক-এক জন পাকাপোক্ত অভিনেতা। এটা হল জীবন নিয়ে নাটক-খেলা। আর পৃথিবীটা হল তার একটা বিরাট রিভলভিং স্টেজ—কোন রুদ্ধ দরজার আড়ালে ছোট্ট প্রেক্ষা-গৃহের মত নয়, মহাশূন্যে চন্দ্র সূর্যের ফ্লাডলাইটে উদ্ভাসিত। পৃথিবী তার সমস্ত সৃষ্টির বোঝা সঙ্গে নিয়ে দিবা রাত্রিতে প্রত্যেক ঘণ্টায় ৭০,০০০ মাইল বেগে সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে। এ বিনা টিকিটের নাটক বলে এতে নামব না—এমন কথা বলার কারুর কোন অজুহাত নেই। যার প্রাণ আছে সেই বাঁচতে চায়, আর সেই চাওয়াটাই হল জীবন-নাটকের সারাংশ। এতটুকু মিথ্যের স্থান এ নাটকে নেই। সবটুকুই সত্যি, তাই সবার হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনা, আশা-নিরাশা, সব জড়িয়ে বাস্তবতার চূড়ান্ত পরিচয় এখানে পাওয়া যায়। পার্ট মুখস্তের ঝঞ্ঝাট নেই; প্রম্পটিং-এর বালাই নেই; জন্ম-মৃত্যুর স্রোতে প্রবহমান; সুখ দুঃখের তরঙ্গে বিক্ষিপ্ত। যুগ থেকে যুগান্তর, ভূত-ভবিষ্যত-বর্তমান, সব কিছুকে মিলিয়ে নিয়ে অদ্ভুত দেদীপ্যমান এর বিষয়বস্তু।

কবে, কখন, কোনদিন, ঘড়িতে তখন তিনটে কি ছটা, যখন এই জীবন-নাটকের ড্রপসীন উঠেছিল, সেকথা আজ কেউই বলতে পারবে না। তার প্রধান কারণ ঘটনাটি যত যুগ আগে ঘটেছিল তত যুগ আগে আমরা কোন শর্মাই উপস্থিত ছিলুম না। বৈজ্ঞানিক তথ্যের উপর ভিত্তি করে এখন অনুমান করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

একথা এখন মোটামুটি ভাবে স্বীকৃত হয়েছে যে প্রায় ২৫০ কোটি বছর আগে জীবনের রঙ্গমঞ্চে প্রথম যবনিকা ওঠে। কেন উঠল এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়া শক্ত। কিন্তু তারপর, কত দৃশ্য কত অঙ্ক চলে গেল, আরও কত বাকি, সে সব নিয়ে অনেক কথাই এখন বলা সম্ভব। সব কথা খুলে বললে মনে হবে, প্রকৃতি হলেন যেন এই বিশ্বসংসারের সবচেয়ে বড় আর্ট-কনয়সর।

প্রথম অদৃশ্য নট আর নটী
প্রায় ২০০ কোটি বছর আগে

এই জীবনের রিভলভিং স্টেজ যাকে বলছি, সেই পৃথিবী নিজেও সূর্যের মাল মসলা দিয়েই তৈরী। এখানে জীবন তৈরী হবার বহু কোটি বছর আগে সর্ব প্রথমে কি করে স্টেজটি তৈরী হল, সে কথা দিয়েই সুরু করা চলে।

একথা মোটামুটি ভাবে মেনে নেওয়া হয়েছে যে একদিন আধদিন কি একবছর দুবছর নয়, পাঁ-চ-শো কো-টি বছর আগে নাকি সৌর জগৎ বলতে কিছুই ছিল না। শুধু মহাশূন্যে অণু-পরমাণুরা স্বচ্ছন্দে ঘুরে ঘুরে বেড়াত। তার অ-নে-ক পরে অণু-পরমাণুরা কাছাকাছি এসে মিলেমিশে নানান গ্রহ উপগ্রহ সব তৈরী করল। তাদের সংখ্যা এত, যে গুনে শেষ করা যায় না—অসংখ্য তারা। সূর্য নিজে তৈরী হবার পর নাকি কল্পনাতীত বেগে মহাশূন্যে ঘুরে চলেছিল—উত্তপ্ত ঘনীভূত গ্যাসের এক সমষ্টি। তা থেকে পরে ঠিক্‌রে বেরিয়ে আসে তারই সামান্য একটা অংশ—আমাদের এই পৃথিবী। সেই সময় আরও কতকগুলো গ্রহ উপগ্রহের সৃষ্টি হয়—যেমন চাঁদ। আমাদের দরকার কেবল এই পৃথিবীটাকে—সূর্য থেকে সদ্য বেরিয়ে আসার পর তখন তার অবস্থা দারুণ। সর্বত্র চলছে অগ্নিকাণ্ড—একটা মস্ত গ্যাসের পিণ্ড।

অনেক অনেক দিন তার ঠাণ্ডা হতে লাগল। কোটি কোটি বছর কেটে গেল—ক্রমে তা ঠাণ্ডা হয়ে জমাট বাঁধল—তাতে নানান স্তর পড়ল। পণ্ডিতেরা বলেন—প্রারম্ভে সমুদ্র বলতে কিছু ছিল না, সাগরের জল তখনও আকাশে বাষ্প হয়ে ঘুরছে। পৃথিবী ঠাণ্ডা হলে অবিরল ধারা নামে, সে এত জল যে সাগর সৃষ্টি হল—সে কি বৃষ্টি! আর এই জলের সূত্র ধরেই যে জীবজগতের নানান প্রাণীরা এসে পরে রঙ্গ ব্যঙ্গ করবে—তখন তা কে জানত? আর এতদিন ধরে তা চলবে অথচ ফুরোবে না!

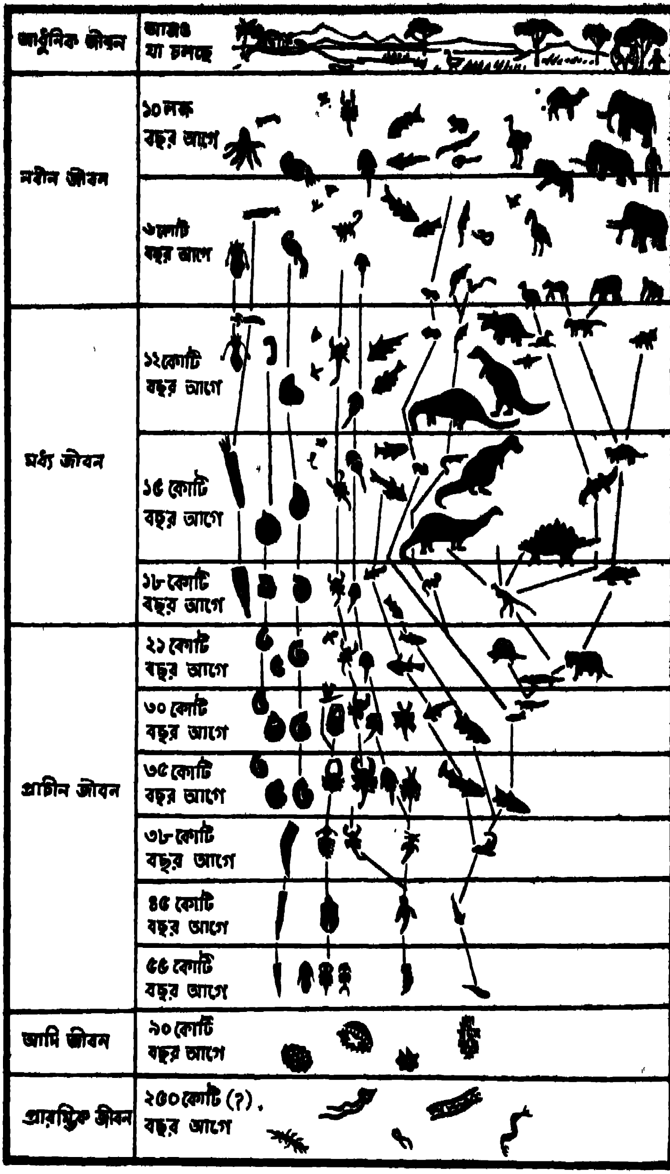
তখন স্টেজ তৈরী হল বটে কিন্তু অভিনয় করবার মত একজনও কেউ ধারে কাছে নেই—চারিদিকে শুধু নিষ্প্রাণ, নিস্পন্দ, জড় পদার্থের রাজত্ব। এরই মাঝে অকস্মাৎ যা স্বপ্নে কেউ কোনদিন ভাবেনি (অবশ্য তখন কেই বা ছিল যে ভাববে!) তাই সত্যি হল। জড়ের সে কি অবিশ্বাস্য পরিণাম! ঘুমন্ত অণুপরমাণু হঠাৎ কেমন করে কাছাকাছি এসে জেগে উঠল—তারা পেল জীবন। এমনি ঘুম ভাঙানিয়া গান দিয়ে প্রায় ২৫০ কোটি বছর আগে ধরণীর রঙ্গমঞ্চে জীবন-নাটকের প্রথম প্রাণ তৈরীর পর্বটি ঘটে। একথা এখন নিঃসঙ্কোচে বলা চলে যে যখন জড়ের গায়ে জীবনের প্রথম পরশটি লাগে তখন পৃথিবীর অবস্থা নিশ্চয়ই আজকের মত এমনটি ছিল না। এমন একটা অকল্পিত শক্তির শিহরণ এই পৃথিবীর বুকের উপর এসে পড়ে যার তাড়নায় নির্জীবেরও জীবন্ত হয়ে ওঠা সম্ভব হয়। কেউ বলেন—আকাশের ঐ বিদ্যুৎ এসে বলে গেছে জেগে ওঠার কথা; আবার কেউ বলেন—আকাশ থেকে তা আসতে যাবে কেন? এ পৃথিবী থেকেই ছাড়া পাওয়া সে কোন সৌর-বিকিরণ হবে। কবে হয়েছিল সে জটিল প্রসঙ্গ না হয় এখন বাদই দিলুম; তার চেয়ে দেখা যাক তার ফল কি হল। প্রাণ আর নিষ্প্রাণের

মধ্যে যতখানি প্রভেদ এ ঘটনার আগে আর পরেও ঠিক ততখানি। দিগন্ত-বিস্তৃত পৃথিবী, তাতে এক কণাও প্রাণ-পদার্থ নেই, কিন্তু কেমন একটা অভূতপূর্ব শক্তির সঞ্চালনের ফলে কতকগুলি নির্জীব পরমাণু কাছাকাছি এসে প্রাণবন্ত হয়ে উঠল। নিজেরা জড় ছিল, কিন্তু বজ্র-ঝলকে তারা এমন একটা সমাবেশ সৃষ্টি করল—যে সমাবেশের গুণই প্রাণ-চাঞ্চল্য। সেই চাঞ্চল্যকেই আমরা বলছি জঙ্গম-জীবন। যদি কেউ সুবিধার জন্যে মনে ভাবেন এ ঘটনাটি কয়েক বস্তা রকমফের জিনিসের ভিতর তড়িৎ প্রবাহ চালিয়ে চালে ডালে মিশিয়ে দেওয়ার মত কিছু—তা কিন্তু মোটেই নয়। এ ঘটনাটি এত সূক্ষ্ম বলেই বোধহয় এত রহস্যাত্মক। সমস্ত ব্যাপারটাই অদৃশ্যলোকের কারবার—তাই এই সব জীবন্ত প্রাণকণাগুলো খালি চোখে দৃষ্টিগোচর হওয়া সম্ভব নয়। এরা অতি সূক্ষ্ম দেহধারী জীব। এই প্রাণকণা বা প্রোটোপ্লাজমএর টুকরোগুলোই সর্বপ্রথম জীবনের রঙ্গমঞ্চে দ্যুতি ছড়িয়ে নট আর নটীর কাজ করে সম্মান পায়। সমস্ত সৃষ্টির মূল এরা। সম্ভবতঃ ২৪০ কোটি বা তারও বেশী বছর আগে পৃথিবীতে এদের প্রথম উদয় হয়। জীবিত বলেই এত ছোট হয়েও তারা দরকারে আধখানা হয়ে নিজেদের মত আরও দুটো প্রাণ-প্রতীক তৈরী করতে সক্ষম। এই ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র প্রোটোপ্লাজম-এর টুকরোগুলোকে বলা হয় ভাইরাস। এমনি চোখে কেন, সাধারণ অণুবীক্ষণের সাহায্যেও এদের দেখা যায় না। এদের দেখতে ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের মত শক্তিশালী যন্ত্রের প্রয়োজন। ভাইরাসের নিজের দেহটি বলতে এখন আমরা বুঝি কতকগুলি অদৃশ্য প্রোটিন-অণুর সমষ্টি। এরা নানারকমের হওয়া বিচিত্র কিছু নয় আর সংখ্যায় এরা অগুণতি, অজস্র। জীবকোষ বলতে এদের কোন কিছু নেই। আছে শুধু কয়েক টুকরো প্রোটিনের সার বস্তু। তাই যথেষ্ট—বেঁচে থাকবার পক্ষে অসম্ভব নয়। ভাইরাস

খুব ছোট্ট কিন্তু ব্যাকটিরিয়া ভাইরাসের পরের স্তর। পরিমাপে বেশ বড়। এদের চেহারা অণুবীক্ষণের সাহায্যে স্পষ্ট করে দেখা যায়—এরা সব জীবাণুর দল। নানারকমেরও হতে পারে। একখানা ভেঙ্গে দুখানা—দুখানা ভেঙ্গে চারখানা—এমনি করে অতি সহজে এদের সংখ্যা লক্ষ লক্ষ হয়ে যেতে পারে। নিষ্প্রাণ পরমাণুর টুকরোর আপনা আপনি কিছু করবার ক্ষমতা নেই—কিন্তু প্রাণবন্ত পরমাণুর টুকরোর? তা জীবিতাংশ বলে অনেক কিছু করবার চাঞ্চল্য রাখে। একে বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম করে রসদ জোগাতে হয় এবং প্রয়োজন হলে ভেঙ্গে তার নিজের মত আরও কণা তৈরী করে বংশরক্ষা করতে এ সক্ষম। জীবনের রঙ্গমঞ্চে এই সব প্রাণকণাগুলো অদৃশ্য নট আর নটীর বেশে কাজ করে চলেছে কোটি কোটি বছর ধরে। এদের সন্ধান আজও পাওয়া যায়। এদের জন্যই আমাদের অনেক হাঙ্গামা পোয়াতে হয়—ভাইরাস থেকে আসে হাম, ইনফ্লুয়েঞ্জা, পোলিওমাইলাইটিস্, পান-বসন্ত, আর ব্যাকটিরিয়া থেকে যক্ষ্মা, কলেরা প্রভৃতি রোগ। মানুষের সমাজে আজও এদের বাস। ভাইরাসরা কিন্তু আবার ব্যাকটিরিয়ার শত্রু হিসাবেও তাদের সর্বনাশ করতে পারে।

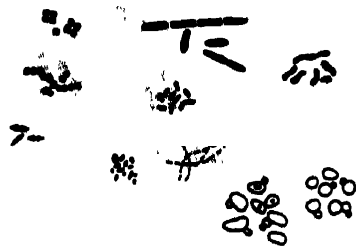
অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের রসরঙ্গ
প্রায় ৯০ কোটি বছর আগে

সৃষ্টি হল; কিন্তু সময় দাঁড়িয়ে নেই—সমানে এগিয়ে চলেছে। জীবন-নাটকেরও সেই সঙ্গে নতুন নতুন দৃশ্যপটের পরিবর্তন হয়ে চলল। এই সময়েরই মাপকাঠি দিয়ে জীবন নাটকটাকে পাঁচটা পর্যায়ে ভাগ করা যায়— ১। প্রায় ২৫০ কোটি বছর আগে প্রারম্ভিক-জীবন; ২। প্রায় ৯০ কোটি বছর আগে আদি-জীবন; ৩। প্রায়

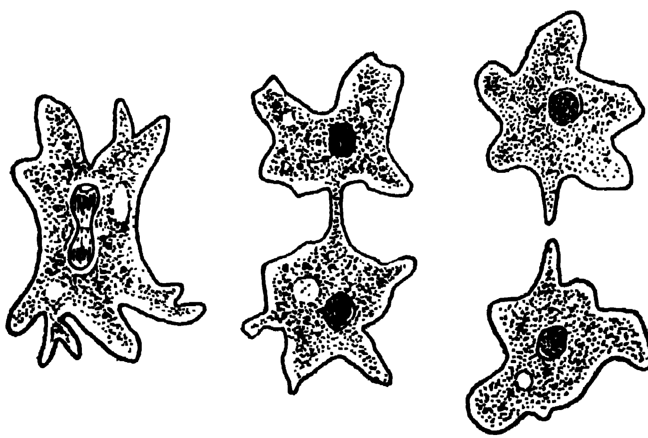


জীবনের পাত্রপত্রিকা — বছরের পিঠে চড়ে কত এলো আর কত গেল, কিছু বা রইল ; কোটি কোটি বছরেও এ যাদুকরণ অফুরন্ত

৫৫ কোটি বছর আগে প্রাচীন-জীবন ; ৪। প্রায় ১৮ কোটি বছর আগে মধ্য-জীবন ; ৫। প্রায় ৬ কোটি বছর আগে নবীন-জীবন। প্রারম্ভিক পর্যায় থেকে জীবনের আদি পর্যায়ে এসে নাটকের মোড় ঘুরল। আগে শুধু ছিল ব্যাকটিরিয়ার মত জীবাণু। পরে নতুন দৃশ্যে নতুন নতুন আগন্তুকের আবির্ভাব ঘটল। অনুমান প্রায় ১০০ বা ৯০ কোটি বছর আগে ব্যাকটিরিয়া থেকে ক্রমে একখানি সেল বিশিষ্ট প্রাণীর উদয় হয়। এরা হল অ্যামিবার দল। এদের আবির্ভাব জীবন-নাটকে নতুন রোমাঞ্চকর আবহাওয়া আনল। শুধু যে এরা আয়তনে ব্যাকটিরিয়ার চেয়ে বড় তাই নয়—এদের জীবনধারণ প্রণালীতেও নতুন ইঙ্গিত দেখতে পাওয়া গেল। আগে কোনপ্রকার জীবকোষ বলতে কিছু ছিল না—এখন জীবকোষযুক্ত প্রাণী তৈরী হল। একখানি জীবকোষ, কিন্তু হেন কাজ নেই যা অ্যামিবা করে না। জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ— খাওয়া-দাওয়া, শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়া, আত্মরক্ষা ও প্রজনন—যাবতীয় সব কিছু কাজ। দেখতে একটুখানি জেলির মত, নিজের শরীরের নির্দিষ্ট কোন চেহারা নেই—সব সময়ে প্রাণ স্পন্দনে টলমল করছে। সাধারণতঃ ব্যাকটিরিয়া শিকার করে এরা বেঁচে থাকে। দরকার হলেই অ্যামিবা নিজের শরীরের কোষখানার ভেতরের প্রাণকেন্দ্রটি (নিউক্লিয়াস) সুদ্ধ ভেঙ্গে দুখানা হয়ে যেতে পারে। তারপর দুটো টুকরো দুমুখে চলে যায়—কেউ কারো ধার ধারে না—দুজনেই তারপর থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ। এই হল এদের সংখ্যা বৃদ্ধির সহজ উপায়। এদের আত্মরক্ষার প্রথা হল জীবকোষের চারিদিকে একরকমের প্রোটোপ্লাজমের বর্ম তৈরী করে চুপটি মেরে বসে থাকা। অ-নে-ক অ-নে-ক দিন কিছু না খেয়ে তারা এমনি করে বেঁচে থাকতে পারে। তারপর আবার চারিদিকের অবস্থা অনুকূল হলে সেই বর্মের আবরণ ভেঙ্গে অ্যামিবা টলটলে চেহারা নিয়ে বার হয়ে আসে। নিজেদের এই সব



ব্যাকটিরিয়া সৃষ্টির শুরু থেকে অদৃশ্য নট আর নটীর বেশে আজও প্রাণের আসর জাঁকিয়ে রেখেছে



অ্যামিবা এমনি বাহাদুর যে ২০০ কোটি বছরেও তার কিছু হয়নি—এখনও প্রাণ-চঞ্চল

বাহাদুরী দেখিয়ে অ্যামিবা ও তাদের সমগোষ্ঠীর সব এককোষী প্রাণীরা জীবনের আদি পর্বে অদ্ভুত সব খেলা দেখিয়েছে। তখন অন্য কোন বড় প্রাণী আত্মপ্রকাশ করেনি। সেই কোন অতীত কাল থেকে অ্যামিবা আজও বেঁচে আছে। ১০০ কোটি বছর হল, তবু এদের ঘরানা বিসর্জন দিতে হয় নি। জীবনের সামান্য এই পরিধি নিয়ে এরা কালের সংগে পাল্লা দিয়ে দিব্যি এখনও বর্তমান।

এর পর দেখা যায় স্পঞ্জ জাতীয় বহুকোষী জীবেরা আসর জমিয়েছে। এখন আর মাত্র একটা সেল্ দিয়ে এদের দেহ তৈরী নয়—নানারকমের জীবকোষের ভীড়। অবশ্য এদের চেহারা দেখে 'আহা মরি' করার কিছু নেই। না আছে হাত, পা, মাথা ; আর না আছে নাক, কান, চোখ। এদের দেহ শুধু কতকগুলো জীবকোষের সমন্বয়। এ যেন শুধু দল পাকান—সব কটা কোষই ভিতরে ভিতরে নিজেরা নিজের মত। কেউ কারুর পরোয়া করে না—কাছাকাছি এক সঙ্গে থাকে এই যা। তবু এরা গোষ্ঠিভাবাপন্ন—এই টুকুই যা অ্যামিবার সঙ্গে মূলতঃ প্রভেদ। অ্যামিবা 'সোলো' গান করত —এরা গলা মিলিয়ে জীবনের 'কোরাস' গাইতে যেন বেশী উদ্‌গ্রীব—ক্রমবিকাশের এক ধাপ এগিয়ে যাওয়ার লক্ষণ। এদের স্বভাব কিন্তু অচরিষ্ণু—এক জায়গায় আঁকড়ে বসে থাকে।

কিন্তু জীবন-নাটক মাত্র এইটুকু দেখিয়েই শেষ হয়ে যাবার নয়। প্রাণ-বিন্যাসের নতুন চাতুর্য দেখতে পাওয়া গেল নানান অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের জীবন-রঙ্গমঞ্চে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে। এই সব বহু-কোষী প্রাণীদের জীবকোষবৈশিষ্ট্য আরও বেশী করে ক্রমে ফুটে উঠল। এদের খাওয়া-দাওয়া, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস, চলা-ফেরা, রক্তচলাচল ও প্রজনন ব্যবস্থার জন্যে বিশেষ বিশেষ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দেখা মিলল। এক কথায় বলা চলে নিজেদের দৈহিক গঠনের জটিলতা এতই

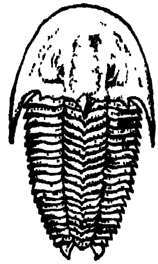
প্রকাশ পেল যাতে এরা জীবন রঙ্গমঞ্চে বেঁচে থাকার ব্যাপারে আগেকার প্রাণীদের অপেক্ষা অনেক 'স্টেজ ফ্রি' হল। জোঁক, কেঁচো আর তাদের অসংখ্য খুড়তুতো-পিসতুতো ভাইরা এই দলে। কোথায় সৃষ্টির উষাকালে একখানি কোষ দিয়ে যাত্রার সুরু, এখন শরীরের ভিতরে অগুনতি জীবকোষ দেখা দিয়েছে; তারা প্রাণ-ধারণের অনিবার্য কাজগুলোর সব সুরাহা করবার জন্য বদ্ধ-পরিকর। জীবনের রঙ্গমঞ্চে এমনি নতুন বাহার দেখিয়ে একের পর এক সব অমেরুদণ্ডী প্রাণীরা এলো—চিংড়ীদের সমগোত্রীয় জীবরা তার পরে বিবর্তিত হল। সৃষ্টির সুরু থেকে ক্রমে ক্রমে জীবনের অসাধারণ বিস্তার ঘটে। নানা রকমের চিংড়ী পর্যায়ের প্রাণী—কুচো, মোচা, বাগদা আর কাঁকড়া, বিছে পোকা-মাকড় সবাই সমুদ্রের নীচে জীবনের জলসায় ভিড় বাড়াল।

জলের বদলে স্থলে পালা বদল
প্রায় ৩৫ কোটি বছর আগে

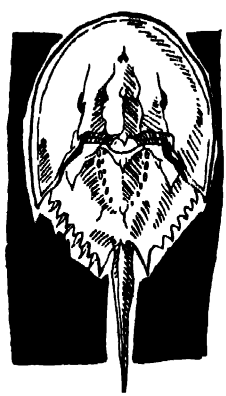
জীবনের যত কিছু লাস্য-লীলা এতদিন চলছিল জলের মধ্যে। ডাঙ্গায় তখনও কোন জীবের প্রসার লাভ হয়নি—জলের মধ্যেই যত কেলী। আজ থেকে প্রায় ৩৫।৩৬ কোটি বছর আগেকার কথা। তখন সমুদ্রের নীচেকার রঙ্গপট গিজ গিজ করছে—নানান রকম খুদে-বড় অভিনেতা অভিনেত্রীদের সমাগমে। ভিড় বাঁচিয়ে স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার আশায় নতুন ভাগ্যের অন্বেষণ স্বাভাবিক। এ যেন অনেকের কলকাতা থেকে বম্বে চলে যাওয়ার মতন—জল ছেড়ে ডাঙ্গায় ওঠার লক্ষণ এই সময়ে দেখতে পাওয়া গেল। সত্যি, জলে এতদিন যা সম্ভব হয়নি ডাঙ্গায় এসে তাই হল, এদের কারুর কারুর বরাত গেল খুলে। বাপ-ঠাকুরদার সাতপুরুষের আবাস হল জল—সেটি ছেড়ে বেরিয়ে আসা চাট্টিখানি ব্যাপার নয়। তবু অমেরুদণ্ডী

প্রাণীদের মধ্যে যারা সর্বপ্রথম জল থেকে উঠে এল, তারা হল বড় বড় সাইজের সামুদ্রিক বিছে—এক একটার সাইজ প্রায় ৮।৯ ফিটেরও মতন ছিল।

একদিকে যেমন কোটি কোটি বছর ধরে নানান অমেরুদণ্ডী প্রাণীর সৃষ্টি ও প্রকাশ হয় তার পাশাপাশি তেমনি চলে মেরুদণ্ডী-প্রাণীর নানান উদ্ভাবন-চর্চা। একথা সত্যি যে দুস্তর সময় অতিক্রম করে অমেরুদণ্ডী প্রাণী থেকেই মেরুদণ্ডী প্রাণীর উদ্ভব। অনুমান প্রায় ৫০ কোটি বছর আগে জীবন-নাটকে এক রকম বিশেষ ধরণের জীবের উৎপত্তি যারা অমেরুদণ্ডী প্রাণীর রাস্তা ছেড়ে সৃষ্টির আনুকূল্যে নতুন পথে অগ্রসর হল। এদের শরীরের ভিতর শিরদাঁড়ার মত একটা মজবুত কাঠামোর আভাসও স্পষ্ট। যার ফলে নিজের দেহটা এরা বেশ ঋজু করে রাখতে পারে। এইসব প্রাচীন পর্যায়ের মেরুদণ্ড-হয়-হয় প্রাণীদের ভিতর থেকে পূর্ণাঙ্গ মেরুদণ্ডী প্রাণী প্রকাশ পায় প্রায় ৪৫ কোটি বছর আগে। মাছকেই সাধারণভাবে সাচ্চা মেরুদণ্ডী বলে ধরা হয়। একটু আগে যে কথা বলা হল, সমুদ্রের নীচের জনাকীর্ণ রঙ্গমঞ্চ ছেড়ে ডাঙ্গায় উঠে এসেছিল যেমন কতকগুলা অমেরুদণ্ডী ঠিক তেমনি মেরুদণ্ডী মাছদের মধ্যে কেউ কেউ জলের মায়া কাটিয়ে স্থলে উঠে এল; বাইরে এসে নতুন উপনিবেশ স্থাপন করবে—মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলবে সেই চেষ্টায়। এই নিঃশ্বাসের ব্যবস্থার জন্যই এদের দেহের আমূল পরিবর্তন করার প্রয়োজন হল। মাছ জল থেকে উঠে এলে আর মাছ থাকল না—হল ব্যাঙ। জীবন-নাটকে সেই থেকে ব্যাঙ পর্বের স্থরু—ডাঙ্গায় তখন রব উঠেছে ব্যাঙ ব্যাঙ ঘ্যানোর ঘ্যাং। শ্বাস যন্ত্রের জন্য আর ফুলকোর প্রয়োজন হল না—তার বদলে এলো ফুসফুস, যার ভেতর শুক্‌নো বাতাসের অক্সিজেন সহজে প্রবেশ করতে পারে। মাছেরা জলে গোলা



ট্রাইলোবাইট প্রাচীন-জীবনের রঙ্গমঞ্চে অমেরুদণ্ডী প্রাণীর মধ্যে অন্যতম-
এর ২০ কোটি বছর আগেকার ফসিল অনেক অন্ধকার ঘুচিয়েছে



লিমুলাস-এর সহকর্মীরা জীবনের স্টেজ ছেড়ে কোন্ কালে বিদায় নিয়েছে—
তবু নিজে হার মানেনি, এখনও একলা গায়েন

অক্সিজেন ফুলকোর সাহায্যে ব্যবহার করে কিন্তু এই সাবেকি প্রথার উপর ব্যাঙরা ক্রমবিকাশের পথে তাদের উপর এক হাত টেক্কা দিলে। কেবল প্রজননের সময় ব্যাঙদের একবার করে জলে আসার প্রয়োজন রয়ে গেল। বাকী সময়ে তারা ডাঙ্গারই বাসিন্দে। কিন্তু কোনও পর্বের মত ব্যাঙ পর্বও চিরস্থায়ী হল না। কারণ ব্যাঙ পর্বের শেষাশেষি প্রকৃতিতে দুর্বিপাক দেখা দেয়। ব্যাঙ জাতীয় প্রাণীরা ডাঙ্গায় বিপদ দেখে প্রাণভয়ে আবার জলে নেবে পড়ার ভ্রান্ত চেষ্টা করল। এই সময় আগ্নেয় উৎপাত হয়। পাহাড় পর্বত মাথা উঁচু করে ওঠে। ফলে না ডাঙ্গায় না জলে এই মাঝামাঝি অবস্থায় পড়ে, অনেক ব্যাঙ জাতীয় প্রাণীরা প্রাণ হারাল; সেই সঙ্গে ব্যাঙ পর্বের অবসান হয়—প্রায় ২১ কোটি বছর আগে।

পৃথিবীর রণচণ্ডী মূর্তি
প্রায় ১৮ কোটি বছর আগে

ব্যাঙ পর্বের ইতি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জীবনের প্রাচীন পর্যায়েরও অবসান হয়। এর পর থেকে যে নতুন পর্বের সূচনা হল, তাকে বলা হয় জীবনের মধ্যপর্যায়। আজ থেকে প্রায় ১৮ কোটি বছর আগে সুরু হওয়া, এই নতুন পর্বকে সাধারণতঃ বলা হয় সরীসৃপ যুগ। আনুমানিক প্রায় ৬ কোটি বছর ধরে এই যুগটি চলে। এই দৃশ্যের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল সরীসৃপদের চেহারার দাপট। এক একটি প্রাণীর কলেবর ভোজ-পুরীকেও ছাপিয়ে গেল। পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে এমন বিরাটাকার বপু আর অন্য কোন প্রাণীর কখনও হয়নি। এই সব বড় বড় সরীসৃপদের নাম দেওয়া হয়েছে ডাইনোসোর। দু জাতের ডাইনোসোর দেখা দিল। একদল শাকপাতা-খাওয়া—অন্যেরা মাংসাশী। বিরাট বপু নিয়ে তারা মহা উল্লাসে পৃথিবী কাঁপিয়ে ঘুরে বেড়াত—সবচেয়ে বড়

ডাইনোসোররা চেহারায় ছিল ৭০ ফিট লম্বা, কেউ বা আবার ৫০ ফিট। এদের হিংস্রতা সর্বজনবিদিত। প্রায়ই নিজেদের মধ্যে খণ্ডযুদ্ধ বাধাত। দাঁতগুলো ছিল জল্লাদের ধারাল অস্ত্রের মত। একবার এ দাঁতের খপ্পরে পড়লে পঞ্চত্ব প্রাপ্তি অনিবার্য। নীল আকাশের নীচে প্রায়ই এরা রক্তগঙ্গা বইয়ে দিত—অন্য প্রাণীরা প্রাণভয়ে সর্বদা তটস্থ। এই সব ভয়ানক ভয়ানক সরীসৃপ ছাড়াও অন্য ছোট বড় নানারকমের সরীসৃপের উৎপত্তি তখনই হয়। এতদিন পৃথিবীতে সাপ বলে কিছু ছিল না—সরীসৃপ যুগের সূচনার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সাপের উদ্ভব হয়। তখনও সাপের ওঝা জন্মায়নি কিন্তু। কচ্ছপ, টিকটিকি, গিরগিটিরা এসে গেছে কিন্তু আসলে তখন ডাইনোসোরদেরই প্রাধান্য।

পৃথিবী এদিকে রণচণ্ডী মূর্তি ধারণ করছে। সরীসৃপ যুগও বেশীদিন চলল না। জীবন-নাটকের দৃশ্যে একটা বিরাট রকম পট পরিবর্তনের সূচনা হল। পৃথিবীর বুক ফেটে পাহাড়গুলো এই সময় বাইরে উঁচু হয়ে উঠতে লাগল—কখনও চলল আগ্নেয় বিস্ফোরণের বাহার, কখনও বা তুষারঝঞ্ঝার অজস্রতা। ভূগর্ভের আলোড়ন পৃথিবী কাঁপাল, বিরাট সরীসৃপদেরও হল পতন। সরীসৃপ মাত্রেই নিজের দেহের তাপ নিয়ন্ত্রণ করতে অক্ষম। দারুণ ঠাণ্ডায় ডাইনোসোররা হিম হয়ে যায়। শীতে কম্বল না পেয়ে যেন ঠক্ ঠক্ করে কেঁপে কেঁপে একেবারে ঠাণ্ডা। ক্রমে ওদের সব শয়তানী জব্দ। ভাগ্যি কোটি কোটি বছর কেটে গেছে—নইলে আজও যদি ওরা বেঁচে থাকত? কলকাতার রাস্তায় কখন আচমকা হাজির হয়ে দোতলাবাসের উপর থেকে ইচ্ছে করলেই টপ করে কাউকে তুলে নিয়ে ভোঁ দৌড়—কিম্বা গড়ের মাঠের মনুমেণ্টের গায়ে পিঠ চুলকোতে চুলকোতে তা ভেঙ্গে ফেলতে পারত। রক্ষে, তারা সব গেছে; কিন্তু ছোটখাট অনেক সরীসৃপরা আজও বেঁচে

আছে। মাঝে সাঝে তারা কেউ কেউ আমাদের চোখে ধরা পড়ে যায়।

উষ্ণ-শোণিতের নবীন অভিযান

প্রায় ১৮ কোটি বছর আগে

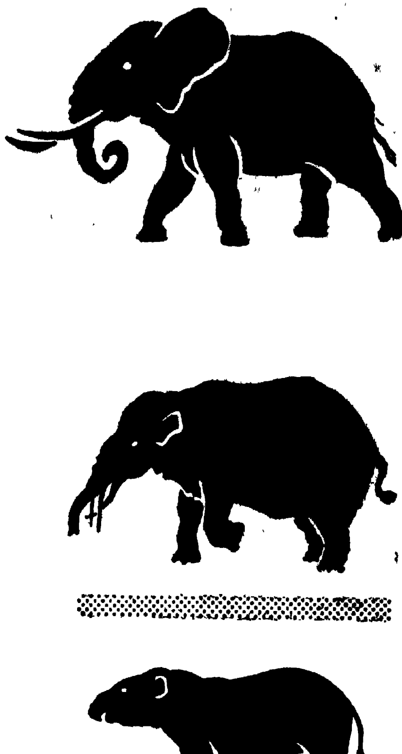
সরীসৃপদের যে কারণে পতন ঘটল—সেই কারণের পাল্টা জবাব দেওয়ার মত সামর্থ্য সেই আমলের কতকগুলো একেবারে নগণ্য সরীসৃপদের মধ্যেই নিহিত ছিল। ডাইনোসোরদের ভয়াল কালো ছায়ার নীচে নাম-না-জানা, মুখ-নীচু-করে থাকা, এই সব মিনমিনে সরীসৃপদের ভিতরই উত্তর পর্বের 'হীরো' হবার সম্ভাবনা লুকান ছিল—একথা প্রথমে বোঝাই যায়নি। এরা অসম্ভবকে সম্ভব করে তুললে। সরীসৃপদের চেহারাখানা বড় এবং বীভৎস হলেও এদের বুকের রক্ত চিরকাল ঠাণ্ডা-জল। প্রকৃতির খেয়াল খুশিতে ঠাণ্ডা গরম রকমফের হলেই এদের শরীরের তাপ ওঠানামা করে। নিজেদের তাপ নিয়ন্ত্রণ করবার কৌশল এদের আজও অজানা। তাই বেজায় ঠাণ্ডায়, দেখতে অতিকায় প্রাণী হলেও এরা নেহাৎ অকর্মণ্য হয়ে পড়ে। কিন্তু একরকমের সরীসৃপের কথা বলা হচ্ছে যাদের দেহের মধ্যে তাপ-নিয়ন্ত্রণ করার দক্ষতা ক্রমে ক্রমে স্পষ্ট হয়ে দেখা দিল। এরাই প্রথম উষ্ণ-শোণিত বিশিষ্ট প্রাণী। এই একটি কারণের সাফল্যই ক্রমবিকাশের পক্ষে অশেষ সুবিধা নিয়ে এল—প্রায় ১৮ কোটি বছর আগে জীবের ধমনীতে প্রথম উষ্ণ-শোণিত নাকি প্রবাহিত হয়। এই আধা-সরীসৃপ আধা-স্তন্যপায়ী জীবদের বিজ্ঞানীরা নাম দিয়েছেন—থিরিওডনসিয়া। তারপর উষ্ণ-শোণিতের অভিযান দুদিকে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ল—একদিকে স্তন্যপায়ী, অন্যদিকে পাখী পর্যায় শ্রেণীর ভিতরে। এক স্তন্যপায়ী আর এক পাখী



প্রায় ৪০ কোটি বছরে ধাপের পর ধাপ বদলে মাছ হল পাখী—তারই নানা রূপান্তরের সাক্ষী

ছাড়া এ দুনিয়ায় আর কোন প্রাণীর শোণিতে উষ্ণতা নেই—আর নেই প্রকৃতি ব্যতিরেকে নিজের দেহের তাপ নিয়ন্ত্রণ করার কৌশল। তাই সরীসৃপদের পর স্তন্যপায়ী আর পাখী জীবনের রঙ্গমঞ্চে সেরা শিল্পী হিসাবে পরিগণিত হল। এদের রকমারি পাত্র পাত্রীর কোলাহলে পৃথিবী মুখরিত হয়ে উঠল। স্তন্যপায়ীদের নানান মহিমা ক্রমে ক্রমে ফুটে উঠল—সাজগোজ করতে গায়ের লোম হল এদের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ; আর মাতৃস্নেহের প্রতীক হল স্তন—যা থেকে এদের নাম। মাতৃস্নেহে ধন্য বলেই এরা স্তন্যপায়ী। সাফল্যের দরজা যখন এদের জন্যে খুলে গেছে তখন স্তন্যপায়ী পর্যায়ের অনেকে নানাভাবে রঙ্গমঞ্চ জাঁকিয়ে বসল। যেমন বাঘ, ভাল্লুক, গণ্ডার, হাতী, উট—এইসব। এরা আজও আমাদের মতন নিজেদের স্ব স্ব ভূমিকায় লোকালয়ের দূরে আর অদূরে কাজ চালিয়ে যায়। এই স্তন্যপায়ী থেকে ক্রমে ক্রমে মানুষের উৎপত্তি হয়। পাখীরাও তেমনি দেখাল সৃষ্টির নানান কৌশল, কেরামতি। আকাশে ওড়বার জন্য বেশী ভাগ পাখীর দেহে সুন্দর কলকব্জার বন্দোবস্ত হল। এল পালকের বাহার, হাড়গোড়গুলো হল হাল্কা, ব্যবস্থা হল দেহের ভিতর অক্সিজেন রাখার থলির আর আকাশে সাঁতার কাটবার জন্য মজবুত পেশীর। এরা অসীম-গগন-বিহারী মুক্ত-পক্ষ বিহঙ্গ কিনা! পাখীর মধ্যে কেউ কেউ ওড়া ছেড়ে দিয়ে মাটিতেই রয়ে গেল—এই যেমন পেঙ্গুইন, অস্ট্রিচ।

সৃষ্টির সূচনার পর বেশ কিছুদিন গেল জল থেকে স্থলে পালা বদল করতে। মাছেরা জলে সাঁতার কাটত, পাখীরা কিন্তু বাতাসে সাঁতার কাটে ; সরীসৃপের ভিতর দিয়ে অনেকগুলো রূপান্তরের স্তর পেরিয়ে তবে মাছ থেকে পাখীর অভিব্যক্তি হয়েছে। সময় লেগেছে প্রায় ৪০ কোটি বছর। এই কোটি কোটি বছরের অন্তর্ধানে



সমস্ত কিছুর যেমন পরের পর রূপান্তর ঘটে, তেমনি জীবনের গজ-পর্বে
গত ৬ কোটি বছরে হাতীর এমনি পরিণাম

পাখীদের মত স্তন্যপায়ীদেরও রূপান্তরের নানান দরজা খুলে যায়। গত ৬ কোটি বছরের মধ্যে দেখা যায় হাতীর এক অদ্ভুত বিবর্তন হয়েছে। সুরুতে হাতীর পূর্ব-পুরুষ ছিল খুব ছোট, একটা বুনো শুয়োরের মত, তেমন বড় শুঁড় ছিল না, গজদন্তও না। এদের পিঠে তখন হাওদা দিয়ে মাহুতের সঙ্গে রাজা মহারাজাদের বন-ভ্রমণে যাবার উপায় ছিল না। আর তখন কোন রাজাই বা যাবে? কেউই জন্মায়নি! পরে আস্তে আস্তে হাতীর চেহারা খুব বাড়ল—সত্যি সে পরিবর্তন রাজকীয়। ঘোড়ার পরিবর্তনও ভাল ভাবে অনুসরণ করা যায়, খুব ছোট থেকে সুরু করে ওয়েলার হর্স পর্যন্ত আস্তে আস্তে বিবর্তিত হয়েছে। দিকে দিকে জীবনের পরিস্ফুটনই ক্রমবিকাশ।

যারা গেয়ে গেল
জীবনের জয়গান

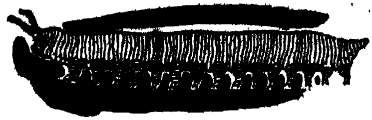
পৃথিবীর এই নাট্যশালায় প্রাণের প্রতীক হিসাবে যত অভিনেতা অভিনেত্রী কোটি কোটি বছর ধরে দেখা দিয়েছে, তাদের বেশী ভাগের কথা এখানে বলা সম্ভব নয়, দুচার জনের মাত্র পরিচয় দেওয়া গেল। কিন্তু এরা সবাই গেয়ে গেছে জীবনের জয়গান। জীবন সৃষ্টি হবার পর থেকে যত রকম প্রাণীর উদ্ভব হয় তাদের সবার সব পরিচয়ও নিখুঁত ভাবে জানা নেই। কেউ কেউ অবশ্য রেখে গেছে তাদের শিলীভূত দেহাবশেষ। সেই সূত্র ধরেই পুরোনো পরিচয়ের হিসেব নিকেশ করা হয়। সবচেয়ে পুরোনো যে প্রাণীর ফসিল পাওয়া যায় তা ৫০ কোটি বছর আগেকার জীব। তার আগেও যে জীবন ছিল সে কথা অনুমান করতে হয় সমুদ্রের নীচে পাওয়া কার্বনের ছোট ছোট চিহ্নগুলি দেখে। এসব কার্বন প্রাণ-পদার্থ-জাত। কোটি বছরের ব্যবধানের মাঝে জীবনের যে পরিণতি—তার নানান ধাপ; এমনি আশ্চর্য রকমের নানা প্রাণীর সব দেহচিহ্ন

বা জীবাশ্ম উদ্ধার করার পর এখন ক্রমপরিণতির নাটকীয় দিকটা খুব ভাল ভাবে ধরা পড়ে। একটা দৃষ্টান্ত দিলেই জিনিসটা পরিষ্কার হবে। সরীসৃপ থেকে যে পাখী তৈরী হয়েছে তার একটা বড় প্রমাণ বিজ্ঞানীদের হাতে আছে। আনুমানিক প্রায় ১৮ কোটি বছর আগে একরকম বিদঘুটে জীব এ পৃথিবীতে ছিল যারা আধা-সরীসৃপ আধা-পাখী। এদের বলি আরকিয়পটেরিক্স। ক্রম-বিকাশের একটা বড় পর্ব এই পথ দিয়েই পার হয়েছে। এমন বিচিত্র জীব শিলীভূত অবস্থায় পাওয়া গেছে। অতএব সরীসৃপ থেকে পাখী হওয়ার রূপান্তরের কথা একরকম সন্দেহাতীত। শুধু জীবাশ্ম কেন, এ পৃথিবীতে জ্যান্ত এমন কতকগুলো জীব টিমটিম করে আজও বেঁচে আছে যারা জীবন-নাটকের অদ্ভুত সব সাক্ষী। এক কালে এদের প্রতাপ প্রতিপত্তি ছিল বহুবিস্তৃত। এরা ক্রমবিকাশের অসাধারণ ভূমিকাও একদিন নিয়েছিল। কিন্তু এখন সাতকাল গিয়ে এদের এক কালে ঠেকেছে। প্রায় ৫০ কোটি বছর আগে চিংড়ীদের একদল জাত-ভাই খুব মাতব্বর ছিল—এদের একটা সরিক আজও বেঁচে আছে, নাম লিমুলাস। এদের আজও বেঁচে থাকাটা আশ্চর্য—না থাকাটা নয়। নীচু পর্যায়ের কেঁচো আর উঁচু পর্যায়ের চিংড়ীর মাঝ-বরাবর একরকম জীবের দেহে, এই দুই জাতেরই বৈচিত্র্য বর্তমান। এদের নাম পেরিপেটাস। এ ছাড়া স্তন্যপায়ীদের মধ্যে একদল মনোট্রিম নামধারী জীব এখনও বহাল তবিয়ৎ-এ বর্তমান, যারা সরীসৃপদের মত ডিম পাড়ে, কিন্তু বাচ্চা দেয় না। এই সব ডিম-পাড়া স্তন্যপায়ীরা অন্যান্য স্তন্যপায়ীদের পক্ষে যতটা কলঙ্ক হোক না কেন, ক্রমবিকাশের নাটকে এদের ভূমিকার গৌরব চিরকাল অক্ষুণ্ণ থাকবে। নতুন দিনের নতুন উদ্যম হয়তো এদের নেই, এখন এরা ম্রিয়মাণ। আজ ক্ষীণকণ্ঠে হলেও একদিন জীবনের জয়গান সপ্তমেই এরা গেয়ে গেছে।

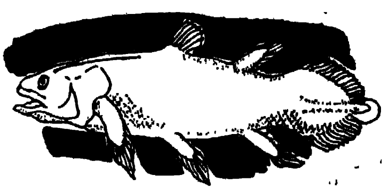
এ নাটকের শেষ নেই

প্রায় ২৫০ কোটি বছর ধরে জীবন-শিল্প-সাধনায় সঞ্জীবিত যে নাটক তা আজও পৃথিবীর স্টেজে তেমনি অম্লান, মুখরিত, গতিচঞ্চল। এতটুকু তার ক্ষয়-ক্ষতি নেই, বরং প্রতিদিন তার অকল্পিত সব সম্ভাবনার সূত্রপাত হয়। কত লক্ষ লক্ষ প্রাণী, কত কোটি কোটি বছর ধরে জীবনে-মরণে এই নাটকে নিয়োজিত। এতটুকু অদৃশ্য প্রাণ-কণা থেকে কি বিরাট কি বিচিত্র প্রাণ-সমারোহ এ পৃথিবীতে গড়ে উঠেছে, তার তুলনা নেই। যেমন প্রাণের অসাধারণ বিকাশ হয়েছে—তেমনি বিচার করলে দেখা যাবে যে মঞ্চের অর্থাৎ এই পৃথিবীটারও সিন সিনারীর বার বার কত পরিবর্তন হয়েছে। সৃষ্টির সুরুতে পৃথিবী ছিল শুধু আগুনে-গ্যাসের উৎখাত কেন্দ্র, ক্রমে তার চারিদিকে সাগর এসে ঘিরে ধরল, বড় বড় মহাদেশের মধ্যে অতীতের সংযোগ হল বিচ্ছিন্ন। পৃথিবীর বুক চিরে পাহাড় মাথা তুলে দাঁড়াল। নানান নদনদীর সাগরে যাওয়ার পথ হল বিবর্তিত, বড় বড় তুষার প্রবাহ এল পৃথিবীতে নেমে। নানা ঝড়-ঝাপটা, নানা রূপান্তরের ওঠা-নামা পৃথিবীর ওপর দিয়ে ঘটে গেল। তবু জীবন-নাটকের মিষ্টি সুরখানি এত অঘটন-ঘটনের মাঝে কখনও খাদে কখনও নিখাদে বেজে চলল, একেবারে থেমে গেল না। কান পাতলে আজও তা শোনা যায়।

এ নাটকের শেষ নেই। এ নাটকের নিত্য পরিবর্তন। এরই মধ্যে বারে বারে নতুন জীবনের আসন পাতা আর আসন তোলা। প্রকৃতি যেন রঙ্গমঞ্চে সব সময়ে খবরদারি করছেন। নাটক অনুযায়ী কত বিচিত্র সব কুশীলব নির্বাচিত হয়েছে। ডারউইন এর নাম দিলেন —প্রাকৃতিক-নির্বাচন। একটা অমোঘ শক্তির নিয়ম পারদর্শীকে



পেরিপেটাস ক্রমবিকাশের এক জীবন্ত সাক্ষী—দেহের আকৃতিতে কিছু কেঁচোর আর কিছু চিংড়ীর বৈশিষ্ট্য থাকায় এক রকম জীব থেকে যে অন্যরকম জীবের বিবর্তন হয়েছে তার একটি প্রমাণ



সিলাকানথ ৭ কোটি বছর আগে জীবনের স্টেজ ছেড়ে চলে গেছে সে-ধারণা ভ্রান্ত প্রতিপন্ন হল ১৯৩৮ সালে, যখন এমন জলজ্যান্ত মাছ দক্ষিণ আফ্রিকায় হঠাৎ পাওয়া গেল



একিডনার তামাসা অন্যরকম—কৌলীন্যে গর্বিত বলে নিজেরা স্তন্যপায়ী হয়েও বাচ্চা দেয় না, পূর্বপুরুষ সরীসৃপের মত ডিম পাড়ে

রাখে মঞ্চের ওপর আর অপারদর্শীকে বেছে আলাদা করে সরিয়ে দেয়; এর ফলে হয় যত নিষ্ফল জীবনের অবসান। কোন অভিনেতা কতদিন কেমন করে রঙ্গমঞ্চে কি ভূমিকায় বহাল থাকবে তা প্রাকৃতিক নির্বাচনের অধীনে। সব প্রাণীর মধ্যে অভিযোজনের দৃষ্টান্ত অতি সাধারণ জিনিস। একটি দৃশ্যে কোন অভিনেতাকে ভাল মানালেই যে অন্য কোন দৃশ্যেও তার তেমন সার্থকতা থাকবে এমন কোন কথা নেই। পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে যারা এককালে চমক লাগিয়েছে তারা নতুন দৃশ্যে সহজেই বেমানান হয়ে যায়। গান বেসুরে বাজলে ছুটি দেবার প্রশ্ন ওঠে। আর নতুন শিল্পীর আসন্ন আগমনের জন্যে নতুন দৃশ্য সাজান হয়। বৈচিত্র্য এমনি যে জীবনের নাট্যশালা কখনও খালি পড়ে থাকে না—সমস্ত শূণ্যতা সমস্ত নিষ্ফলতাকে অতিক্রম করে জীবনে বারবার নতুন পর্বের আয়োজন হয়। এমন কতবার হল আরও কতবার বাকি!

সমস্ত জীবন-নাটকের পেছনে একটা অমিতবিত্ত প্রাণ-প্রবাহ রয়েছে; অনাদি কাল থেকে সেই প্রবাহই জীবনকে অবিরত এগিয়ে নিয়ে চলে। নতুন দৃশ্যের অবতারণা হয়েছে, নতুন ঘটনার জালবোনা হয়েছে, এত অভিনেতা, এত দুস্তর সময়, এত বিস্তৃত স্টেজ, এত রসরঙ্গ,—এ যেন কখনও নিঃশেষ হবার নয়। এ শুধু জীবনের অফুরন্ত যাদুকরী! এত ঘটনা যখন ঘটে গেছে তখনও সবচেয়ে বড় অভিনয়-করনে-ওয়ালা অর্থাৎ এক কথায় যাকে বলা যেতে পারে নট-সূর্য—সেই মানুষ তখনও এসে পৌঁছয়নি। জীবনের রঙ্গমঞ্চ মানুষের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে শিল্প চাতুর্যে এক অভাবনীয় পরিণতি লাভ করল। তখন শুধু এই পৃথিবীটা নয় সারা সৌর জগৎটা নিয়েও একটা বিচিত্র রঙ্গ সুরু হল যার জুড়ি ইহজগতে আর কোথাও নেই। এ আর শুধু খেলা নয়—সব কিছুকে নিয়ে খেলানও।

সময়ের সঙ্গে জীবনরঙ্গমঞ্চে পট পরিবর্তন

গত ১০ লক্ষ থেকে আধুনিক কাল (প্লিসটোসিন)	হিমযুগ অতিক্রম করে মানুষের আবির্ভাব—বুদ্ধির নতুন অভিযান—সভ্যতা, সমাজ, বিজ্ঞানের প্রকাশ
৬ কোটি থেকে ১০ লক্ষ (টারসিয়ারি)	স্তন্যপায়ীদের রাজত্ব—পোকামাকড়দের প্রভাব ক্ষুণ্ণ—পাখীদের আকাশে নতুন সাফল্য—প্রাক্ মানুষ জাতীয় জীবের সূচনা
১২ কোটি থেকে ৬ কোটি (ক্রিটেসাস)	স্তন্যপায়ীদের আধিপত্য বিস্তার—বর্তমান পতঙ্গদের আবির্ভাব—বড় বড় সরীসৃপদের বিদায়—পাখীদের পরিণতি—আল্পস্, হিমালয় প্রভৃতি পাহাড়দের মাথা উত্তোলন
১৫ কোটি থেকে ১২ কোটি (জুরাসিক)	বড় বড় সরীসৃপদের আসর—বর্তমান সময়ের প্রায় সব রকম অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের আত্মপ্রকাশ
১৮ কোটি থেকে ১৫ কোটি (ট্রায়াসিক)	সরীসৃপরা রাজার আসনে—পোকামাকড়দের বিস্তর সাফল্য—ভবিষ্যতে স্তন্যপায়ী জীব হওয়ার প্রথম পদক্ষেপ
২১ কোটি থেকে ১৮ কোটি (পারমিয়ান)	ট্রাইলোবাইট নিঃশেষ—পতঙ্গদের অগাধ প্রতিপত্তি—অনেক পাহাড়পর্বতের উদ্ভব
৩০ কোটি থেকে ২১ কোটি (কারবোনিফেরাস)	প্রথম সরীসৃপ আর প্রথম পতঙ্গ জাতীয় প্রাণীর বিকাশ
৩৫ কোটি থেকে ৩০ কোটি (ডেভোনিয়ান)	শুধু জলে নয় এখন স্থলেও নতুন উপনিবেশ স্থাপনা—নানান রকম মাছদের বিকাশ—উভচর প্রাণীরও বিবর্তন—সমুদ্রের জল সরে যাওয়ায় ডাঙা জেগে ওঠা
৩৮ কোটি থেকে ৩৫ কোটি (সিলুরিয়ান)	মেরুদণ্ডী প্রাণীদের অভিযান—নানান রকম মাছদের প্রতিপত্তি—ট্রাইলোবাইট ম্রিয়মাণ
৪৫ কোটি থেকে ৩৮ কোটি (ওর্ডভিসিয়ান)	নানান অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের জয়জয়কার—ট্রাইলোবাইট, নিউটিল্যেড প্রভৃতির আসর—সম্ভবতঃ প্রথম মেরুদণ্ডীজীবেরও সূচনা
৫৫ কোটি থেকে ৪৫ কোটি (ক্যামব্রিয়ান)	ধারাবাহিক ফসিলের যোগসূত্র—স্পঞ্জ, ট্রাইলোবাইট ও শামুক জাতীয় জীবের চিহ্ন
৯০ কোটি থেকে ৫৫ কোটি (প্রোটারোজোইক)	ফসিল একান্ত বিরল, এককোষী প্রাণীদের প্রসার, সম্ভবতঃ নানান অমেরুদণ্ডী প্রাণীদেরও আগমন
৩০০ কোটি থেকে ৯০ কোটি (আরকোজোইক)	পৃথিবীর উদ্ভব, চাঁদ আর অন্যসব গ্রহউপগ্রহ তৈরী, জ্বলন্ত পৃথিবীর ক্রমে তাপহীন অবস্থা, প্রচুর বৃষ্টির ফলে মহাসমুদ্রের উৎপত্তি—তারপর অকস্মাৎ একদিন জীবনের উন্মোচন
৫০০ কোটি বছর আগে (?)	পৃথিবীর এই রঙমহল তখনও তৈরী হয়নি—শুধু পরমাণুরা নিঃসীম শূন্যে বিক্ষিপ্ত



নতুন আগন্তুক

ক্রমবিকাশের নবীনতম আগন্তুক
মানুষ

আলোঝলমল এই পৃথিবী সত্য, সত্য এই নিঃসীম আকাশ, সত্য এই সূর্য চন্দ্র কোটি নক্ষত্র, সময়ের রথে অনন্ত কালের অবিরল যাত্রাও সত্য। সৃষ্টির এই অজস্রতার মাঝে সবার উপরে মানুষ সত্য। তার উপরে আর কিছু নয়। কিন্তু আজকের এত বড় কঠিন সত্যটা আগে সত্য ছিল না—কালক্রমে তা সম্ভব হয়েছে জীবনের ক্রমবিকাশের ভিতর দিয়ে। বিশ্বের দরবারে মানুষ এখন অপ্রতিম। বিশ্বসংসার তার নামে নামময়। সব কিছুর উপর সে এখন সর্বেসর্বা—সেই-ই ইচ্ছাময়। ভাগ্য-দোষের কিছু নয়, ভাগ্যগুণেই বলতে হয়, এমন অসাধ্যসাধন সম্ভব হয়েছে। কোন অমরার নির্বাসিত দেবদূতের বংশধর আমরা নই; মাটির এই পৃথিবীতেই আমাদের জন্ম, এখানেই ব্যাপ্তি, এখানেই পরিণতি। এখানেই আমাদের মরণ-বাঁচন। পৃথিবীর মানুষ ক্রমবিকাশের দাক্ষিণ্যে ধন্য, বিবর্তনের অদ্বিতীয় মুখপাত্র। মানুষের মানুষ-হওয়া তো একদিনের নয়—এর পিছনে একটা তিমির-নিবিড় কুহেলিকাচ্ছন্ন বহু পুরোনো ইতিহাস আছে।

পৃথিবীর যাবতীয় প্রাণীর সঙ্গে মানুষ আত্মীয়তার সূত্রে বাঁধা, সে স্তন্যপায়ী। অন্যান্য বাঁদরদের সঙ্গে সেও প্রাইমেট জাতীয় প্রাণী। সে হোমিনিডি পরিবারভুক্ত—যদিও এখন মানুষ ছাড়া জীবিত আর কোন প্রাণীই এই পরিবারে পড়ে না। তার বিজ্ঞান-সম্মত গালভরা নাম হল—হোমো সাপিয়েনস সাপিয়েনস—যার মানে বুদ্ধিমান লোক। মানুষ নিজে বিচক্ষণ, তা না হলে নিজের এমনধারা নামকরণ করে বসে!

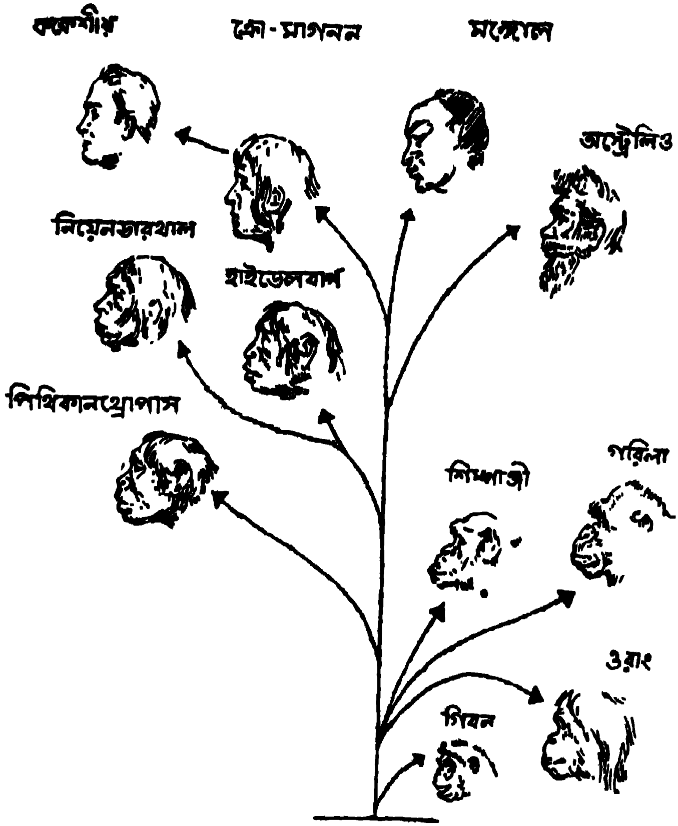
এই বুদ্ধিমান জীবটির ক্রমপরিণতির ইতিহাস সমস্ত জীবনের ইতিবৃত্তের তুলনায় বলতে গেলে কিছুই নয়। জীবনের আরম্ভ আনুমানিক ২০০ বা ২৫০ কোটি বছর আগে—তারপর চলতে সুরু করার পর জীবন একদণ্ডের জন্যও থামেনি। একবার আরম্ভ, তারপর শুধু নিত্য নূতন ভঙ্গিমায় জীবন ক্রমবিকাশের পথ ধরে অজস্র ভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। আর মানুষ! তার সূচনা মাত্র গত ১০ লক্ষ বছর আগে। কোথায় ২৫০ কোটি বছর আর কোথায় মাত্র ১০ লক্ষ বছর! অবশ্য গত ১০ লক্ষ বছরে মানুষ-তৈরীর ইতিহাস আগেকার জীবন-তৈরীর ২৫০ কোটি বছরের ইতিহাস থেকে স্বতন্ত্র নয়। মাত্র তার সর্বশেষ পরিণতির কথা। মানুষ হালের কালে এ পৃথিবীতে এসে দেখা দিয়েছে।

মানুষের বিবর্তনের ধারা বিশ্লেষণ করলে জানা যায় যে গত ১০ লক্ষ বছরে পৃথিবীর অবস্থাটা আজকের মতন ছিল না। এই ১০ লক্ষ বছরে পৃথিবীর উপর দিয়ে চার চারটে ভীষণ হিম যুগ চলে গেছে। প্রথম হিমযুগটি পৃথিবীর উপর নেমে আসে আনুমানিক ১০ লক্ষ বছর আগে। আর সর্বশেষটি আসে প্রায় ৮০ হাজার বছর আগে। এর মধ্যে আরও দুটো শীতের সময় চলে গেছে। দুটি হিমযুগের ভিতর বেশ কিছুদিন চলে আন্তর-হিমযুগের উষ্ণ সময়। এই অন্তবর্তীকালের মধ্যে হাজার হাজার

বছরের ব্যবধান। হিমযুগের ব্যাপকতা এত ছিল যে উত্তর মেরু থেকে বরফের স্রোত নেমে আসত ইউরোপে, উত্তর-আমেরিকার মধ্যবর্তী অঞ্চলে। এখনকার ফ্রান্স ইংলণ্ড তখন বরফে চাপা পড়ে থাকত। এইসব হিমযুগের আতিশয্যে প্রাণীকুলের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হয়ে ওঠে তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। এমনকি এই তুষারশীতল আবহাওয়ার ফলে বহু প্রাণী পৃথিবী থেকে চিরকালের মত নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। কিন্তু আশ্চর্য, এই তুষারঝঞ্ঝা উপেক্ষা করে তারই মাঝে সৃষ্টির নিখুঁত জীব মানুষটির বিবর্তনপর্ব অনুষ্ঠিত হয়। মানুষের উদ্ভাবন পর্ব এরই মাঝে আপন গতিবেগে অদ্ভুত ভাবে এগিয়ে গেছে।

মানুষ গড়তে বাঁদর
কত রূপান্তরের পর্ব

মানুষ কি করে এবং কোথা থেকে এলো এ প্রসঙ্গ তোলার আগে একটি কথা বোধহয় পরিষ্কার করে নেওয়া ভাল। সেটি হল অনেক লোকের আজও এ ধারণা যে বাঁদর থেকে মানুষ তৈরী হয়েছে অর্থাৎ মানুষের পূর্বপুরুষরা হল চিড়িয়াখানার যত কপিকুল। এ কথা কিন্তু আদৌ সত্যি নয়। মহামতি ডারউইন-এর নামের সঙ্গে যুক্ত করে এই যে অপপ্রচার করা হয়ে থাকে তা নিতান্তই ভ্রান্ত, অলীক বা স্বপ্নপ্রসূত। আধুনিক বিজ্ঞানে এই কথাই সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করা হয়েছে যে মানুষের এবং বাঁদরের (তাও সব বাঁদরের নয়, মাত্র কয়েকটির) বহু অতীতে পূর্বপুরুষ ছিল এক। সেই অতীত দিনের বিস্মৃতপ্রায় এক যোগসূত্র থেকে ক্রমে ক্রমে এবং ধাপে ধাপে মানুষ এবং বাঁদর ক্রমবিকাশের বিভিন্ন পথে চলে আসে। এ কথা এখন আর না মেনে উপায় নেই যে প্রায় দশলক্ষ বছর আগে এ পৃথিবীতে যেমন আধুনিক মানুষের কোন



স্থষ্টির কারখানাতে মানুষ এবং বাঁদর একই সময়ে পাশাপাশি তৈরী হয় ভিন্ন পথে—কেউ কারুর পূর্বপুরুষ নয়। বিস্মৃত কোন এক যোগসূত্র হতে দুজনাই উদ্ভূত

অস্তিত্ব ছিল না তেমনি বড় বাঁদরেরও কোন চিহ্ন ছিল না। সৃষ্টির কলে তখন এ তুরকম জীবই তৈরী হবার তুপথে সমভাবে এগিয়ে চলেছে।

মোটামুটিভাবে জানা আছে, যে সব বাঁদর জাতীয় জীব মানুষের কাছাকাছি আসতে পারে তারা হল গিবন, ওরাং ওটাং, শিম্পাঞ্জী ও গরিলা। হাড়পাঁজরে মানুষের সঙ্গে এদের মিল থাকলেও তফাতের কিন্তু অন্ত নেই। এদের বুকের ছাতি বড়, আঙ্গুলগুলো লম্বা লম্বা, শরীরের তুলনায় হাত তুটো বেজায় ঝোলা, পা শুধু গাছে ঝোলাবার উপযোগী, মাটিতে সোজা হয়ে এদের চলা একরকম তুঃসাধ্য ব্যাপার। যখন এরা কোনমতে দাঁড়াবার চেষ্টা করে তখন শরীরের ভার পায়ের চেটোর মাঝখানে পড়ে না—বরং তুপায়ের বাইরের তুধারে চাপ এসে পড়ে। এদের মধ্যে গিবন সবচেয়ে ছোট। গাছেই তার বসবাস। মাথার খুলির ভিতরকার পরিমাপ হবে ৯৭ থেকে ১২৫ কিউবিক সেন্টিমিটার (সি সি)। গিবনের চেয়ে বড় ওরাং ওটাং, যাকে পরিহাস করে বিজ্ঞানীরা বলে থাকেন বোর্ণিয়-সুমাত্রার 'বন্য-মানুষ'। এদের করোটীর মাপ ৩০০ থেকে ৫৩০ সি সি র মধ্যে। শিম্পাঞ্জী ও গরিলা হল আফ্রিকার বনমানুষ। শিম্পাঞ্জী মাটিতে থাকতে ভালবাসে। এদের করোটীর পরিমাপ ৩২০ থেকে ৪৮০ সি সি র মধ্যে। আর গরিলার গাছে ও জমিতে তু-জায়গাতেই স্বচ্ছন্দ বিহার। সাধারণতঃ শিম্পাঞ্জী ৫ ফিট ও গরিলা ৬ ফিট লম্বা হয়। গরিলার করোটীর মাপ ৩৮০ থেকে ৫৯০ সি সি র মধ্যে। এদের মধ্যে গরিলার সঙ্গে মানুষের সাদৃশ্য সবচেয়ে বেশী।

অনেকটা আনাড়ি মূর্তিকারের মনোভাব নিয়ে ক্রমবিকাশ এই পৃথিবীতে কাজ করে চলেছে। মানুষ গড়তে গিয়ে যেন বারবার বাঁদর গড়া হয়েছে। সৃষ্টির সম্পূর্ণ সার্থকতা আনতে অনেক ভাঙ্গা, অনেক গড়া, অনেক সময়, এমনি চলে গেছে। কিন্তু তার পরে?

সত্যিই নগণ্য জীবশ্রেণীর ভিতর থেকে একদা মানুষ মূর্ত হয়ে উঠল। সৃষ্টির এই কারখানাতে পাওয়া যায় প্রথম যুগের মানুষ তৈরীর সব উপাদান সামগ্রী; সেগুলিকে দেখলে মনে হয় প্রথমদিনের আধা-মানুষ আধা-বাঁদরের জীবাশ্ম। এইসব নানান শিলীভূত কঙ্কালগুলি পাশাপাশি রাখলে অভিব্যক্তির সম্ভাবনা এবং তার ক্রমপরিণতিটা খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ সব জীব অসার্থক রচনার সামিল; আজ এরা আর বেঁচে নেই। মানুষ তৈরীর জয়যাত্রার পথ এরা তৈরী করে দিয়ে গেছে—সেইটুকুই যা কৃতিত্ব। এই রকম বিচিত্র ধরণের নানান রহস্যাকীর্ণ জীবের একটি দুটি দাঁত, করোটীর ভাঙ্গা অংশ, চোয়াল কিম্বা হাত বা পায়ের অস্থির শিলীভূত কঙ্কাল নানা জায়গা থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের কাছে এইসব ভগ্ন অংশ মহা মূল্যবান। সেগুলো থেকেই অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে জীবের ক্রমপরিণতির ইতিহাস পরিষ্কার করে ফুটিয়ে তোলা যায়।

আজ থেকে প্রায় ২৫ লক্ষ বছর আগে প্রাইমেট গোষ্ঠী (যাতে মানুষ ও বাঁদর দুই-ই পড়ে) দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। তার একটি ভাগ গিবন্ প্রভৃতি গাছে-চড়া বাঁদরের ভিতরে প্রসারিত হয়েছে। অন্যটি শিম্পাঞ্জী, গরিলা ও মানুষের আদি-পুরুষের বংশ শাখা—প্রোকনসোল। ভারতবর্ষের শিবালিক পর্বতের গায়ে এক রকম বড় প্রাইমেটের দাঁতের ও চোয়ালের জীবাশ্ম খুঁজে পাওয়া গেছে। এই সব ড্রায়োপিথিকাসদের দেহগত আকৃতিতে শিম্পাঞ্জী ও গরিলার ছাপ সুস্পষ্ট। তা ছাড়া মানুষের বৈশিষ্ট্য বেশ কিছু পরিমাণে লক্ষণীয়। দক্ষিণ আফ্রিকার এক গুহা অঞ্চল থেকে প্রায় ২০ লক্ষ বছর আগেকার একরকম বাঁদরাকৃতি জীবের শিলীভূত কঙ্কাল সম্প্রতি উদ্ধার করা হয়েছে। এদের গঠন বৈচিত্র্য নানাদিক থেকে খুব মূল্যবান। এদের বলা হয় অস্ট্রেলোপিথিকাইন। এরা নাকি অসাধারণভাবে মানুষভাবাপন্ন ছিল। মগজের পরিমাপ ৬৫০

সি সি—প্রায় বাঁদর শ্রেণীর মতই। কিন্তু দাঁতের বিশেষত্ব অনেক পরিমাণে মানুষের কাছাকাছি। এরা সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারত। অনুমান যে এরা মাংসাশী ছিল। কিন্তু কোন কালে বাঁদররা মাংস ছোঁয় না। অনেক বিশেষজ্ঞের মতে এরা নাকি আগুনের ব্যবহার পর্যন্ত জানত, সেই কারণে এদের মধ্যে সেরা জীবটিকে বলা হয় অস্ট্রেলোপিথিকাস প্রোমিথিউস। গ্রীক রূপকথার প্রোমিথিউসের মত জীববিজ্ঞানীর মতে এরাই নাকি প্রথম প্রাণী যারা সর্বাগ্রে পৃথিবীতে আগুনের ব্যবহার করে। অনেক বৈজ্ঞানিক এ মতকে আদৌ গ্রহণ করেন না এবং এরাই মানুষের যথার্থ পূর্বপুরুষ কিনা তা নিয়েও সন্দেহ প্রকাশ করে থাকেন। একথা অবশ্য নিঃসঙ্কোচে বলা চলে যে অস্ট্রেলোপিথিকাস ক্রমবিকাশের পথে একটা অবিস্মরণীয় স্তর—গাছের আগডাল ছেড়ে দিয়ে মাটিতে হাঁটি হাঁটি পা পা করে চলার পক্ষে জীবনে এটি একটি অদ্ভুত পরিণতির আভাস। বাঁদরভাব কাটিয়ে ওঠার এক নিদারুণ চেষ্টা।

দুপায়ে ভর করে আদি-মানুষ দাঁড়াল
প্রায় ৬ লক্ষ বছর আগে

অবশেষে একদিন এই পৃথিবীতে প্রথম-অবস্থার মানুষ দুপায়ে ভর দিয়ে মাথা তুলে দাঁড়াল। এই বিশ্ব জগৎটার সঙ্গে যেন একটা বোঝাপড়া করতে হবে। সে আজ থেকে প্রায় ৬।৭ লক্ষ বছর আগেকার কথা। সে বোঝাপড়া অবশ্য আজও মানুষের শেষ হয়ে ওঠেনি—নিত্য নূতন নজরে প্রত্যহ মানুষ এখনও পৃথিবীকে প্রত্যক্ষ করে চলেছে। সৃষ্টির রঙ্গমঞ্চে মাথা উঁচু করে তুলে এমন করে দাঁড়ান আর কোন জীবের সাধ থাকলেও সাধ্য নেই। এ এক মানুষেরই সাজে। কিন্তু সেদিনের প্রথম মানুষ জড়ত্বের সমস্ত



যবদ্বীপে প্রায় ৬ লক্ষ বছর আগেকার মানুষের প্রমাণ পাওয়া যায়—এরা দু পায়ের উপর ভর করে সোজা হয়ে চলতে পারত তাই এদের বলা হয় হোমো ইরেকটাস পিথিকানথ্রোপাস

বাঁধন সরিয়ে উঠে দাঁড়ালেও মনুষ্যত্বের তখন বিকাশ ঘটেনি—মাত্র বোধোদয়। এক নতুন সঙ্গতির সুস্পষ্ট ইঙ্গিতটুকু মূর্ত হয়ে উঠছে—তখনও গর্ব করবার মত অনেক কিছুই বাকি। তবু একথা কল্পনাতেও কারুর আনা বোধহয় সম্ভব ছিল না যে এইসব তথাকথিত বনের মানুষই উত্তরকালে মনের মানুষ হয়ে পৃথিবীকে আলো করে দেবে।

কি তার বীভৎস চেহারা—অঙ্গে কমনীয়তার এতটুকু ছাপ পর্যন্ত নেই। আধা-মানুষ আধা-বাঁদর প্রায়। শুধু জীবনের দেনাটুকু পরিশোধ করে দেওয়া ছাড়া তখন অন্য কিছুর বালাই নেই। জীবনের স্থূল চাওয়া আর পাওয়া, তার অধিক আর কি! গিরিগহ্বরে আলো-আঁধারিতে এমনি করে বেঁচে থাকার নিমিত্তমাত্র হয়েই মানুষের জীবনযাত্রার সুরু। তবু সমস্ত অসহায়তার মধ্যে মানুষ তার ভাগ্য প্রতিষ্ঠা করতে চিরদিন কৃতসঙ্কল্প। প্রকৃতির মাঝে নিঃশেষে নিজেকে সে হারিয়ে ফেলেনি অন্যান্য প্রাণীদের মত।

আদিতম মানুষের যে পরিচয় শিলীভূত কঙ্কাল থেকে এ পৃথিবীতে পাওয়া যায় তা এশিয়া মহাদেশ থেকেই—ইউরোপে নয়। ইউজিন ডুবয়িস নামে একজন ওলন্দাজ ফৌজী-ডাক্তার একদিক দিয়ে রীতিমত ভাগ্যবান। তিনি মানুষের পূর্বপুরুষের কিছু নিদর্শন নিশ্চয় খুঁজে বার করবেন এই অভিপ্রায় আগে ঘোষণা করলেন। তারপর যবদ্বীপে এসে, তিনি সত্যসত্যই আদি-মানুষের এমন মহামূল্য সব অতীত চিহ্ন আবিষ্কার করে ফেললেন যা শুধু অভাবনীয় নয়, তা দৈবাৎ ঘটে। তাঁর নাম এই মহামূল্য আবিষ্কারের ফলে চিরকাল অমর হয়ে থাকবে। পূর্ব যবদ্বীপে সোলো নদীর ধারে ট্রিনীল-এর কাছে মানুষের পায়ের ফিমার হাড়ের শিলীভূত কঙ্কাল প্রভৃতি জিনিস উদ্ধার করেন। তারপর সোলো নদীর কূল ধরে অনেক অন্বেষণই হয়, এবং মানুষের কঙ্কালের

আরও কিছু জীবাশ্ম আবিষ্কৃত হয়। বিশেষজ্ঞরা এইসব হাড় গোড় তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করে এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছলেন যে এইসব শিলীভূত অস্থি এমন একরকম বিচিত্র জীবের—যার শরীরের আকার-প্রকারে মানুষের ছাপ সুস্পষ্ট থাকলেও বেশ কিছু পরিমাণে বানরাকৃতিও ছিল। কিন্তু এইসব জীব যে নিঃসন্দেহে সোজা হয়ে চলতে পারত এ কথা পায়ের হাড় দেখে সহজেই অনুমেয়। এইসব বিচিত্র জীবদের নাম দেওয়া হল—পিথিকানথ্রোপাস ইরেকটাস অর্থাৎ 'Errect-ape-man'। পিথিকানথ্রোপাস-এর মগজের পরিমাপ ছিল ৭৫০-৯০০ সি সি পর্যন্ত। এখনকার মানুষের পরিমাপের (১,৩৫০ সি সি) তুলনায় অনেক কম। বাঁদরের চেয়ে কিন্তু বেশী ছিল—বাঁদরের মগজের মাপ প্রায় ৬০০ সি সি ধরা চলে।

যবদ্বীপ থেকে পিথিকানথ্রোপাস-এর এই অবিস্মরণীয় আবিষ্কারের পর আবার এশিয়ার আর এক জায়গা থেকে আর একরকম আদি-মানুষের নানান ফসিল পাওয়া যায়। দ্বিতীয় রকম আদি-মানুষের ফসিল পিকিংএর ৩৭ মাইল দূরে চৌকৌটিয়েন নামে এক জায়গায় চূণা-মাটীর পাহাড়ের গুহার মধ্যে আবিষ্কৃত হয়। এদের নামকরণ করা হয়েছে—সিনানথ্রোপাস পিকিনানসিস। প্রচুর পরিমাণে এবং নানারকমের কঙ্কালের সব জীবাশ্ম হস্তগত হয়েছে। অনুশীলনের পর এই কথাটাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে এইসব সিনানথ্রোপাস জাতীয় আদি-মানুষের সঙ্গে পিথিকানথ্রোপাস-এর চেহারার খুব মিল ছিল। এরাও সোজা হয়ে চলতে পারত কিন্তু এদের মগজের পরিমাপ পিথিকানথ্রোপাস-দের চেয়ে আরও বড় ছিল—৯১৫ সি সি থেকে ১,২০০ সি সি। শুধু এইটুকু যা পার্থক্য যে সিনানথ্রোপাস-দের এই পৃথিবীতে আবির্ভাব ঘটে আরও কিছুদিন পরে—আনুমানিক ৫,৫০,০০০ বছর থেকে ২০০,০০০ বছর আগে হবে। এদের দুজনের বেলায়ই দেখা যায় ভ্রূর নীচেকার

হাড় অত্যধিক স্পষ্ট ছিল। পিছনের দিকে হঠাৎ-ঢালু-হয়ে-যাওয়া ছিল কপালের গড়ন, আর মুখখানা ছিল রীতিমত ছুঁচল। এদের সাদৃশ্যের উপর ভিত্তি করেই এখন এই দুই জাতের আদি-মানুষকে বলা হয়—হোমো ইরেকটাস—কারণ এরা সোজা হয়ে চলতে পারত। যবদ্বীপে এবং পিকিংএ পাওয়া নিদর্শনের উপর ভিত্তি করে এ কথা বলা যায় যে হোমো ইরেকটাস-রা পাথরের তৈরী স্থূল যন্ত্র ব্যবহার করতে জানত এবং আগুনের ব্যবহারও এদের কাছে অজানা ছিল না। এশিয়ায় পাওয়া হোমো ইরেকটাস-এর মত এত ব্যাপক নিদর্শন ইউরোপে এখনও পাওয়া যায়নি। যদিও জার্মাণীতে হাইডেলবার্গ সহর থেকে যে প্রস্তরীভূত চোয়ালটি পাওয়া যায় সেটি দেখে অনেকে মনে করেন যে এটি এশিয়ার হোমো ইরেকটাস-এর সমগোত্রীয়, শুধু প্রভেদ এই যে তারা এই অঞ্চলেই তখনকার দিনে বাস করত, এশিয়ায় নয়।

হোমো ইরেকটাস-দের পরিচয় লাভের ভিতর থেকে আধুনিক মানুষের ক্রমপরিণতির ইতিহাস যে খুব প্রাঞ্জল হয়ে উঠেছে সে কথা বলাই বাহুল্য।

মানুষ হতে আর খুব বেশী বাকী নেই

প্রায় ২ লক্ষ বছর আগে

যত দিন গেছে মানুষ তৈরীর কাজও ক্রমে তত এগিয়ে গেছে। বিচিত্র এই দেহটা—এইটের ওপরেই সময়ের যত কেরামতি। কোথায় বনবাদাড়ের জড়ভরত কদাকার এক জীব আর অন্যদিকে সভ্যভব্য সৌম্যকান্তি মানুষ। জন্ম জন্ম ধরে দেহের উপর একটু একটু করে সৌকুমার্যের পলস্তরা পড়ে ক্রমে সুন্দর মানুষের বিবর্তন হয়। হোমো ইরেকটাস-এর পর আরও অভিনব ধরণের আদি-মানুষের হারান স্মৃতিচিহ্ন উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।

এইসব পরের স্তরের মানুষগুলোর শিলীভূত পরিচয় থেকে বুঝা যায় যে এরা হোমো ইরেকটাস-এর চেয়ে উন্নত ধরণের জীব ছিল। পশ্চিম জার্মাণীর রূর অঞ্চলে নিয়ানডার ভ্যালি থেকে বিচিত্র ধরণের সব ফসিল আবিষ্কৃত হয়। তারপর আরও খোঁজাখুজির পর এই ধরণের প্রস্তরীভূত কঙ্কাল ইউরোপের নানা জায়গা থেকে সংগৃহীত হয়। ফ্রান্স, জিব্রাল্টার, ইটালী এবং ভূমধ্যসাগরের পরপারে উত্তর আফ্রিকার ট্যানজিয়ার্স-এও এই একই ধরণের বহু জীবাশ্ম আবিষ্কারের ভিতর থেকে এই কথাটাই মনে করা স্বাভাবিক যে ইউরোপে এবং উত্তর আফ্রিকায় এমন এক বিশেষ ধরণের মানুষ তখন বাস করত যাদের সে সময় বেশ প্রতিপত্তি ছিল; আজ থেকে আনুমানিক দেড় লক্ষ বছর আগে হবে। পণ্ডিতেরা এই ধরণের মানুষকে আখ্যা দিলেন হোমো নিয়েনডারথালেনসিস (নিয়েনডারথাল)। কঙ্কালের বিশেষত্ব পরীক্ষা করলে এ কথা প্রকাশ পায় যে এই সব নিয়েনডারথালেনসিস-জাতীয় মানুষদের চেহারা খুব একটা কন্দর্পকান্তি না হলেও হোমো ইরেকটাসদের চেয়ে অনেক বেশী গুণ মানুষভাবাপন্ন। এইটেই সবচেয়ে বড় কথা যে এইসব আদি-মানুষদের মগজটা ছিল বেশ বড় ধরণের— প্রায় ১,৪৫০ সি সি। এত বড় মগজের পরিমাপ লাভ বিবর্তনের একটা সুস্পষ্ট লক্ষণ। এরা লম্বায় ছিল প্রায় ৫ ফিট ৪ ইঞ্চি। হাঁটু দুটো ছিল কেমন একটু দোমড়ান। আর মাথাটা সবসময়ে দেহ থেকে বেশ খানিক সামনের দিকে আগিয়ে থাকত। চোখের কোটরের উপরের হাড়গুলো ছিল বেশ পুরুষ্টু এবং টানাটানা। নাকগুলো ছিল চওড়া অথচ থ্যাবড়া। চিবুকের এতটুকু বালাই ছিল না। তলাকার চোয়ালের বহর ছিল বিরাট। এই সব নিয়েনডারথালেনসিস-জাতীয় মানুষরা তখনও গুহাগহ্বরে বাস

করত। মাথায় তাদের বুদ্ধি নানা দিকে খেলতে সুরু করছে। নভোনীলিমায় পূর্ণচন্দ্র দেখে মনের পাত্রখানি হয়তো তারা খুশীতে ভরে নিতে পারত না কিন্তু প্রতিকূল সমস্যার মাঝে জীবনটাকে বাঁচিয়ে রাখার রীতিনীতি এবং কৌশলের আবিষ্কার যে করতে পারত তাতে আর কোন সন্দেহ নেই। তখন ইউরোপে চলেছে তৃতীয় হিমযুগের শেষাশেষি সময়—তারই মাঝে এদের বেঁচে থাকা। একথা সহজে অনুমেয় যে সেই ঠাণ্ডার দিনে তারা প্রথম গায়ে আবরণ তুলে নিল। পাথর ঘসে নানারকমের জীবনধারণের ব্যবহার্য যন্ত্র তৈরী করল। বড় বড় শিকারে জীবনপণ করতে এতটুকু শঙ্কিত হত না—শিকার করে খাদ্যসংগ্রহ করবার তাগিদে তারা বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াত। সার্থক শিকার মিললে মাংস থাকত খাবার জন্যে আর চর্বিটা জমিয়ে আলো জ্বেলে নিশুতি রাতে তারা আপনার পুত্র-পরিজনদের হিংস্র শ্বাপদের হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখত। মানুষ মারা গেলে তার অন্তিম ক্রিয়া সম্বন্ধে গোর-দেওয়ার প্রথা তাদের মধ্যে সংস্কার হয়ে দাঁড়াল! এই ভাবে তাদের মধ্যে নানা রকম চেতনা ধীরে ধীরে বিকশিত হল। মানুষের বেঁচে থাকার সে কি দুরন্ত প্রয়াস!

নিয়েনডারথালেনসিস-দের সমসাময়িক প্রাচীন মানুষের অস্তিত্ব পরে আফ্রিকা প্রভৃতি জায়গা থেকেও প্রমাণিত হয়েছে। এখন সবাই একরকম প্রায় মেনে নিয়েছেন যে নিয়েনডারথালেনসিস-জাতীয় আদিমানুষ উন্নত হয়ে প্রায় আধুনিক মানুষের স্তরেই-এসে পৌঁছেছিল কিন্তু তবু এদের এখনকার মানুষের যথার্থ পূর্বপুরুষ ধরা হয় না। তার হয়তো প্রধান কারণ আরও এক রকমের উন্নত ধরণের মানুষের পরিচয় নিয়েনডারথালেনসিস-দের প্রায় সমসাময়িক কালেই পাওয়া যায় যাদের আধুনিক মানুষের প্রকৃত জনক হিসাবে স্বীকার করবার যথেষ্ট কারণ আছে।



ইউরোপের ২ লক্ষ বছরের আগেকার মানুষ—হোমো সাপিয়েনস ; এরা নিজেদের জীবনযাত্রার মান ক্রমশঃ অদ্ভুত ভাবে উন্নত করে তুলতে সক্ষম হয়

আধুনিক মানুষ এলো
প্রায় ৭৫ হাজার বছর আগে

প্রায় ৭৫,০০০ বছর আগে যখন ইউরোপে চতুর্থ বা শেষ হিম-যুগ চলছে তখন সেই ঘোর ঠাণ্ডার দিনে নিয়ানডারথালেন-সিস-জাতীয় মানুষরা সারা ইউরোপের বুক জুড়ে মালিকানা ভোগ করছে। এই সময়ে হঠাৎ তাদের উপর অসতর্ক আক্রমণ এমনভাবে এসে পড়ল যে তাদের অস্তিত্ব অচিরে লোপ পেতে বসল। এ আক্রমণ আর অন্য কোন ভীষণ হিংস্রপশু বা জানোয়ার থেকে আসেনি, এসেছিল আর এক উন্নত ধরণের মানুষ ক্রো-মাগনন (ক্রো-মাইন ̃)দের কাছ থেকেই। দুজনেই হোমো সাপিয়েনস সম্প্রদায়ের। কিন্তু তাদের মধ্যে অপ্রত্যাশিত এই দ্বন্দ্ব দেখা দিল শুধু ভাগ্য প্রতিষ্ঠার জন্য। ক্রো-মাগনন-রা স্বভাবতঃ নিয়ানডারথালেনসিস-দের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী ছিল। এ শক্তি শুধু শারীরিক দক্ষতার কথা নয়, তাদের বুদ্ধিমত্তার সৌকর্যের। ক্রো-মাগনন-রা যে কত বুদ্ধিমান ছিল সেটা স্পষ্ট বোঝা যায় যখন তাদের করোটীর মাপ আমরা বিচার করি। পরিমাপ ছিল ১৬৫০ সি সি। এখনকার মানুষের চেয়েও বেশী। বুদ্ধির জোরেই ক্রো-মাগননরা নিয়েনডারথালেনসিস-দের বশ্যতা স্বীকার করাতে পারল। ক্রো-মাগননদের চেহারা ছিল খুব লম্বা—উঁচুতে প্রায় ৬ ফিট। মুখের আকৃতির মধ্যে চিবুকের স্পষ্ট ধরণটি লক্ষণীয়। চোয়াল আর এখন এদের বিকটাকার নয়। চেহারাটা দেখলে সুশ্রী বলতে হয়। স্পষ্ট বড় কপাল আর ভ্রূদুটিতে জান্তব ভাব বলতে কিছু নেই। হাতে থাকত তীর আর ধনুক—যার সাহায্যে শত্রু তাড়নার কাজ হত সহজ। সব কিছুর উপরে ক্রো-মাগনন-রা একটা উন্নতধরণের জীবন যাত্রার মান আবিষ্কার করতে পারল। সেইটেই সবচেয়ে বড় কথা।

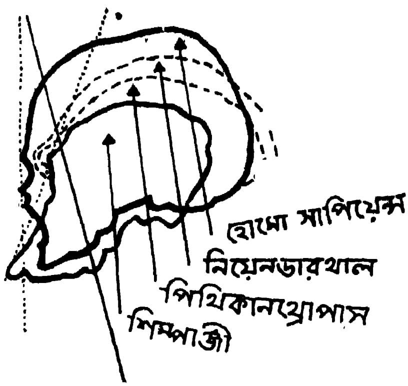


আফ্রিকাতেও পুরোনো মানুষের অনেক কথা জানা গেছে—এরা প্রায় ১ লক্ষ বছরের আগেকার হোমো সাপিয়েনস—সম্ভবতঃ নিগ্রোদের পূর্বপুরুষ

নিয়েনডারথালেনসিস-রা নিত্য ব্যবহারে যেসব জিনিসের কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি সেই সব চমকপ্রদ জিনিস ক্রমে ক্রমে এরা আবিষ্কার করল। সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পাথরের তৈরী জিনিস দেখতে পাওয়া গেল এই প্রথম। হাড়ের থেকেও যে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের চাহিদা অনেকটা মেটান যায় সে কথা আমরা এই প্রথম জানতে পারি ক্রো-মাগনন-দের কারিগরি নমুনা দেখে।

শুধু জীবনের স্থূল চাহিদা মেটানর বাসনাতেই মনে হয় ক্রো-মাগনন-জাতীয় মানুষের জীবনবৃত্তি নিঃশেষিত হয়ে যায়নি। যে সব গুহার ভিতরে এদের বসবাস ছিল সেই সব গুহার দেওয়ালে এরা রেখে গেছে অদ্ভুত সব চিত্র-বিচিত্র রঙ্গিন জীবজন্তুর প্রতিমূর্তি। এত নিখুঁত এত জীবন্ত এই সব আঁকা যে আজও তা দেখলে বিস্মিত না হয়ে উপায় নেই। এই সব অঙ্কন, শিল্পের খাতিরে কি ভয় ভাবনার হাত থেকে বাঁচবার উপলক্ষ হিসাবে, তা অবশ্য বলা যায় না। কিন্তু দেখবার তাদের চোখ ছিল, আঁকবার মন ছিল এবং মনোবৃত্তির মধ্যে সুচারু ভাব ছিল, এ কথা অনস্বীকার্য।

সারা ইউরোপের মধ্য ও পশ্চিম দিকে ক্রো-মাগনন-জাতীয় মানুষের নানান নিদর্শন পরে উদ্ধার করা হয়। এইরকম মানুষের প্রথম কঙ্কালটি ফ্রান্স থেকে পাওয়া যায়। কার আহ্বানে কোথা থেকে ক্রো-মাগনন-রা ইউরোপে আসে তার সঠিক কোন খবর জানা নেই। অনেকে মনে করেন এরা হয়তো মধ্যপ্রাচ্য কিম্বা আফ্রিকার উত্তর দিক থেকে এদিকে আসে। ভূমধ্যসাগরের পরপারে উত্তর আফ্রিকার আলজিরিয়াতেও ক্রো-মাগনন ধরণের মানুষের বসবাসের চিহ্ন বেশ সুপরিস্ফুট। তা ছাড়া কেনিয়া ও টাঙ্গানিকাতেও ক্রো-মাগনন-দের সমসাময়িক মানুষ সম্বন্ধে নানান কথা এখন জানা গেছে। কিন্তু এশিয়ায় ক্রো-মাগনন-দের সমসাময়িক মানুষের তথ্য আজও বিশেষ কিছু জানা নেই। তবে পিকিংএর



মগজটার পরিমাপও মানুষ-হওয়ার সঙ্গে বেড়েছে—বুদ্ধির সব ফন্দি এখানে লুকান থাকে



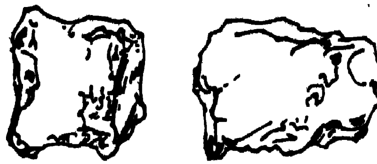
অভিব্যক্তির সঙ্গে চোয়ালের ক্রমপরিণতি হয়েছে, চিবুক স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—মানুষের মুখেও কমনীয়তা এসেছে

কাছে কিছু এই জাতীয় নিদর্শন বৈজ্ঞানিকদের হাতে এসেছে যাতে মনে হয় এখানেও ক্রো-মাগনন-পর্যায়ের মানুষ ছিল। কিন্তু আমেরিকা থেকে মানুষের প্রাচীন ইতিহাসের কথা ভাল জানা যায় নি—সম্ভব মানুষ সেখানে হালের কালেই পৌঁচেছে। বহু আগে ছিল না।

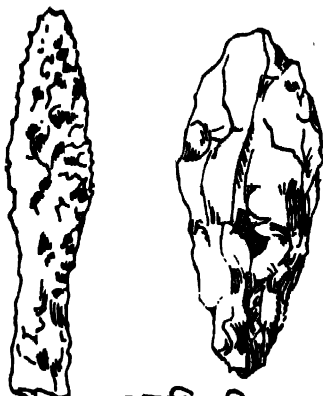
ক্রো-মাগনন-রাই এখনকার হোমো সাপিয়েনস-এর পূর্বপুরুষ। এদের ভিতর দিয়েই মানুষ আধুনিক পর্যায়ে এসেছে। ক্রমবিকাশই এই পরিবর্তনের মূলমন্ত্র। কিন্তু ক্রো-মাগনন থেকে হোমো সাপিয়েনস-এ রূপান্তরিত হবার পর মানুষ কত বিচিত্রভাবে নানা দেশ দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়েছে এবং নানা ভিন্নমুখী পথে কত জাতি ধর্ম সমাজ ব্যবস্থার নানা রূপায়ণ করেছে ; সেই রূপান্তর ও পরিণতির ধারাবাহিকতার সব কথা আজও অস্পষ্ট হয়ে রয়েছে।

মানুষ অদ্বিতীয়
কারণ ক্রমবিকাশের সে অধিনায়ক

এটা ঠিকই যে আজকের মানুষ আগে এমনটি ছিল না—খুব বেশী নয়, ১।২ লক্ষ বছর আগেও, তার দেহগত আকৃতিতে জড়তার শত বাঁধন ছিল। ক্রমবিকাশ তাকে সে বন্ধন থেকে মুক্তি দিয়েছে। দেহে এনেছে কোমল-কান্তি, অপরূপ লাবণ্য। কিন্তু সব কিছুর উপরে মানুষ উত্তরাধিকারী হয়েছে এমন এক বুদ্ধিদীপ্ত মনের যার তুলনা এ পৃথিবীর আর কোন প্রাণীর সঙ্গে করা চলে না। সেইজন্যেই সমস্ত জীবজগতের ক্রমবিকাশের মাঝে মানুষ জড়িয়ে থাকলেও অন্য কোন প্রাণীর থেকে সে এত স্বতন্ত্র। জীবজগতে তার শ্রেষ্ঠত্ব অনস্বীকার্য। সে বুদ্ধির খেলোয়াড়। তার ক্রমবিকাশের এত অভাবনীয় সার্থকতার মূলে রয়েছে সর্বপ্রথম তার পায়ের উপর ভর দিয়ে সোজা হয়ে চলবার সুন্দর ভঙ্গী। দুখানি হাত আর



ইওলিথ



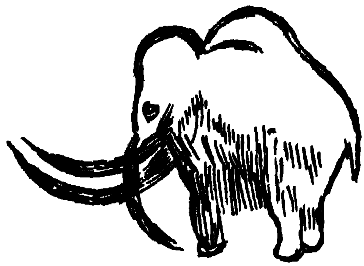
প্যালিওলিথ



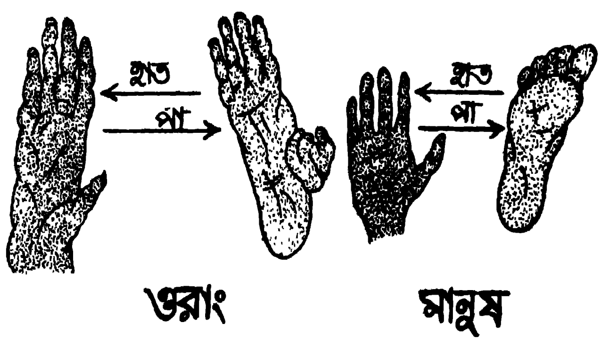
নিওলিথ

সুনিপুণ হাতের তৈরী এইসব পাথরের জিনিস আদি-মানুষের জীবনযাত্রা নির্বাহের সম্বল

তার শরীরের ভার বহন করার প্রয়োজনে লাগল না। ঘুরে ঘুরে তার হাত এখানে সেখানে নানা জিনিসকে নাড়াচাড়া করতে সুরু করল। আর তার চোখছুটোয় এলো নতুন দর্শনের আলো—বাইনাকুলার ভিসান। চোখের দেখা এখন শুধু চোখেই শেষ হয় না—তা মনের দেখায় পরিণত হয়। ছুহাতের ছোঁওয়া ছুচোখের দেখা বারবার বুদ্ধির মূলে ঘা দেয়—আনে ভাববার নিত্য প্রয়াস। মানুষের মাথায় এমন একটি কল তৈরী হয়েছে যার ফলে মানুষ না করতে পারে এমন কিছু নেই। এ ছাড়া ক্রমবিকাশের ভিতর দিয়ে মানুষের দেহে আরও কতকগুলি সার্থক জিনিস দেখা দিয়েছে, যা অন্য কোন প্রাণীর পক্ষে পাওয়া ছুর্লভ। তার দাঁত অন্যান্য প্রাণীর মত একরকম কাজ করবার যন্ত্র নয়। মানুষের দাঁত দিয়ে একই সঙ্গে কামড়ান, ভাঙ্গা এবং পেষা, সব কাজই করা চলে। দেহের প্রত্যঙ্গ চালনার দক্ষতা ও ক্ষিপ্রতা মানুষের অদ্ভুত রকমের। অন্য প্রাণীর সেরকম নেই বললেই হয়। মানুষের দেহের তুলনায় হাতগুলো বেজায় লম্বা নয়, পাগুলো বরং হাতের চেয়ে দীর্ঘ—বাঁদরদের বেলা এর উল্টোটা দেখতে পাওয়া যায়! মানুষের মুখের আর একটি বিশেষত্ব হল চিবুক—অন্য প্রাণীদের যা নেই। পূর্বপুরুষের উত্তরাধিকার লেজ এবং দেহের বেশীভাগ জায়গা থেকে চুল অপসারিত হয়েছে। মানুষের ভ্রূণের ভিতর গঠনের সময় এখনও এই পুরোনো জিনিসগুলো অতীতের সাক্ষীর মত কিছুকালের জন্যে এসে আবার মিলিয়ে যায়। মানুষের চোয়াল হনুমানের মত অত বড় নয়—সারা মুখের সঙ্গে তার একটা সামঞ্জস্য আছে। হাতের ও পায়ের বুড়ো আঙ্গুলগুলো নড়ানয় বাধা নেই। শিরদাঁড়াটা শরীরের ভিতরে এমন ভাবে লাগান রয়েছে যাতে দেহটাকে সোজাভাবে এবং মজবুত ভাবে সব সময়ে ধরে রাখতে পারা যায়। মানুষের মত সুন্দর ওষ্ঠাধর ও নাকের বাহার প্রাণিজগতে আর কোন



প্রায় ১৫ হাজার বছর আগেকার মানুষের আঁকা হাতীর একটি সুন্দর নকসা, হাতের অদ্ভুত মুন্সীয়ানার সাক্ষী



মানুষের হাতের আর পায়ের সঙ্গে কিছুর তুলনা হয় না, নিজের বৈশিষ্ট্যে তারা অনন্য। এমন করে ধরবার এমন করে চলবার আর কারুর সাধ্য কি! এরা যন্ত্রের উপর সেরা যন্ত্র

জীবদেহে মেলে না। ঘ্রাণের পটুতা কমে এলেও দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা মানুষের বেশী। কুকুর বেড়াল চেঁচামেচি করে থাকে কিন্তু মানুষের আছে কণ্ঠস্বর—ভাব প্রকাশের বিশেষ উপায়। নিজেকে ব্যক্ত করবার এমন কৌশল প্রাণিজগতে আর কোথায়ও নেই। যৌনবোধের মূলমন্ত্র হল প্রকৃতির দেনা পরিশোধ করা। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে দেখা যায় যৌনস্পৃহার সঙ্গে বংশ রক্ষার সম্বন্ধটা তত প্রকট নয়। মানুষ সঙ্গীসাথী নিয়ে ঘর বাঁধতে চায়—সন্তান লালন করতে চায়। তার অর্থই পুরুষ ও নারীর মধ্যে আকর্ষণটা অনেক ব্যাপক এবং স্থায়ী। নিম্ন জীবের পর্যায়ে আছে শুধু নিছক জৈব-ধর্মের আবেদন। তা ছাড়া মানুষের প্রজননের কোন নির্দিষ্ট প্রাকৃতিক সময় নেই—যেমন অন্যান্য প্রাণীদের আছে। মানুষের বসন্ত ঋতু নিরপেক্ষ। এমনি করে পৃথিবীতে একটি একটি পরিবার একত্রে থেকে সৃষ্টি করেছে বড় বড় গোষ্ঠী—মানুষ স্বভাবতঃ গোষ্ঠীভাবাপন্ন। আর একটি বড় কথা হল, সব মানুষই জীবতত্ত্বের দিক দিয়ে এক রকম প্রাণী—হোমো সাপিয়েনস। উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত যেখানে যত মানুষ আছে তারা সবাই হোমো সাপিয়েনস। আপাতঃ-বৈষম্যটা জৈবিক বৈষম্য সৃষ্টি করে না। মাপে ছোট কি বড়, গায়ের রং কালো কি ফরসা, চুল কোঁকড়ান কি লম্বা, এগুলো শুধু বাইরের আড়ম্বর ; ভিতরে মৌলিক তফাৎ কিছু নেই। হোমো ইরেকটাস থেকে হোমো সাপিয়েনস-এর উদ্ভব হওয়ার পর নানা জায়গায় নানা ভাবে ক্রমবিকাশ অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু কোন মানুষই হোমো সাপিয়েনস-এর মৌলিক বৈশিষ্ট্য তাতে হারিয়ে ফেলেনি। মানুষ মানুষই রয়ে গেল। তাই দেখলে আশ্চর্য লাগে একটা গোবরে পোকা ক্রমবিকাশের আনুকূল্যে ভেঙ্গে কালক্রমে একশো রকম হওয়া বিচিত্র নয়। এ পৃথিবীতে পাখীর রকমফের আছে প্রায় ৮,৬০০ রকম এবং ৩,৫০০ রকমের

বনচারী-মানুষ কতদিন ধরে কতস্তর পেরিয়ে তবে হল মনোচারী-মানুষ

প্রায় ৭৫ হাজার বছর আগে	Λ	হোমো সাপিয়েনস সাপিয়েনস
মনোচারী-মানুষ		১৮৬৮ সালে ফ্রান্স-এ ও পরে জার্মাণী প্রভৃতি জায়গায় শিলীভূত কঙ্কাল উদ্ধার করা হয়
প্রায় ২ লক্ষ বছর আগে	Λ	হোমো নিয়েনডারথালেনসিস
কিছু মনোচারী কিছু বনচারী-মানুষ		১৮৫৬ সালে জার্মাণীর নিয়ানডার ভ্যালিতে মাথার খুলি ও পরে বেলজিয়াম, স্পেন ও পালেস্টাইন থেকে সম্পূর্ণ কঙ্কাল শিলীভূত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়
প্রায় ৪ লক্ষ বছর আগে	Λ	হোমো ইরেকটাস পিকিনানসিস
বনচারী-মানুষ		১৯২৭ সালে পিকিং-এর কাছে প্রথমে দাঁত পরে সম্পূর্ণ কঙ্কাল শিলীভূত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়
৬ লক্ষ বছর আগে	Λ	হোমো ইরেকটাস পিথিকানথ্রোপাস
বনচারী-মানুষ		১৮৯০ সালে যবদ্বীপে মাথার খুলি, পায়ের হাড় ও দাঁত শিলীভূত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়

স্তন্যপায়ী। কিন্তু মানুষ একবার তৈরী হওয়ার পর লক্ষ বছরেও নানারকম হোমো সাপিয়েনস-এ পর্যবসিত হয়নি। পার্থক্য এসেছে জায়গায় জায়গায় অনেক—ভাষাগত, সমাজগত, কৃষ্টিগত; কিন্তু রক্তমাংসের মানুষটা তার মৌলিকত্বে আসলে সব জায়গায় সমান।

এই পৃথিবীতে মানুষের স্থান স্বতন্ত্র, তার একটি কারণ বুদ্ধিমান মানুষ প্রকৃতির মধ্যে অসহায় অবস্থায় নিজেকে ফেলে রাখেনা। নিত্য নূতন পন্থায় নিজের ভাগ্যান্বেষণের উপায় এবং অবলম্বন বার করেছে এবং আজও করছে। যে পারিপার্শ্বিকতার মাঝে মানুষ জন্মায়, তারই মধ্যে সে নিজের প্রভাব বিস্তার করে, তাকে পরিবর্তন করে। সব কিছুর তলে তলে চলেছে স্বাচ্ছন্দ্যের বাসনা। এ পৃথিবীতে ক্রমবিকাশের আঙ্গিনায় মানুষ নবীনতম আগন্তুক; কিন্তু তার বুদ্ধির জোরে সে শুধু যে অন্য প্রাণীদের অনেক পিছনে ফেলে রেখে এগিয়ে চলেছে তাই নয়, প্রকৃতির চ্যালেঞ্জও সে গ্রহণ করেছে তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে।



জানবার চাবিকাঠি

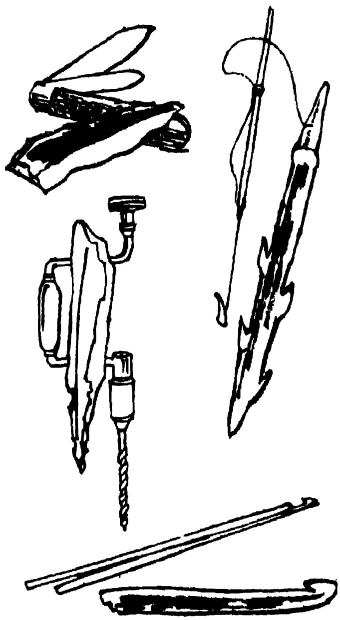
পাথর দিয়ে সুরু

চিরকাল মানুষ এমনি। কি এক দুরন্ত মনের অতৃপ্ত বাসনা নিয়ে এ পৃথিবীতে সে জন্মেছে। কিছুতে যেন তার আর শান্তি নেই। অস্থির তার চিত্ত। দুর্বিনীত তার আকাঙ্খা। অজানায় তার গভীর তৃষ্ণা। নিরুদ্বেগচিত্তে কখনও মানুষ বেশীদিন এক জায়গায় স্বস্তিতে বসে থাকতে পারে না। যাবতীয় পার্থিব জিনিসে তার অদম্য কৌতূহল—হাতের বাইরে দৃষ্টির অগোচরে যত কিছু, তাতেই তার আপ্রাণ অনুধ্যান। আসল কথা—পৃথিবীর এই তালাবদ্ধ রহস্যঘরের চাবিকাটিগুলো মানুষ নিজের হাতের মুঠোয় পেতে চায়; কারণ তার মনোবাঞ্ছা হল, ইহজগতের ইচ্ছা-অনিচ্ছার রাজসিংহাসনে বসে, সে ভবের খেলায় মালিক হবে। তাই তার রক্তে জানবার এত নেশা, চোখ দিয়ে খুঁজে দেখা তার পেশা।

কোনদিনও কেউ রাজসমারোহে মানুষকে ডেকে এনে রহস্য-ঘরের দরজা খুলে সাদর আহ্বান করেনি, যেমন কেউ তার কানে কানে বলে দিয়ে যায়নি কার্যসিদ্ধির বীজমন্ত্র; অথবা আকাশ

থেকে কেউ ছুঁড়ে ফেলে দেয়নি 'রহস্যলোকের যত চাবির গোছা। মানুষের একমাত্র সহায় হল—তার বুদ্ধীন্দ্রিয়। তার নিজের সক্রিয় চেষ্টার ফলে, তার ভাবনা-চিন্তা, ধ্যান-ধারণা, সবটুকু লাগিয়ে, মানুষ রহস্যলোকের পথ উন্মুক্ত করে চলেছে—অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়া সব চাবিকাঠির হদিস করছে। জীবনপণ করে মানুষের এই যে সাধনা এতো শুধু তার ভাগ্য প্রতিষ্ঠার জন্যে নয়—নিজেকে শত ভঙ্গিমায় ব্যাপ্ত করবার, প্রকাশ করবার এবং ফুটিয়ে তুলবার সর্বাঙ্গীন প্রচেষ্টা। একজন দুজন তিনজনের এ কাজ নয়। যত মানুষ তত চেষ্টা—যুগ যুগ প্রচেষ্টার ফলে আসে সাফল্য। মনুষ্য-জীবন প্রাপ্তির পর থেকেই এই জ্ঞানান্বেষণ। আমরা যে প্রাণীটিকে বলি মানুষ, সে এই পৃথিবীতে এসেছে আজ থেকে আনুমানিক প্রায় ৭৫ হাজার বছর আগে। সেই থেকেই সুরু হয় জানবার চাবি-কাটি উদ্ধারের। সত্যিকার মানুষের সভ্যতার ইতিহাস কিন্তু গত ৩।৪ হাজার বছরের বেশী নয়।

বহু আগে মানুষ থাকলেও সভ্যতা বলতে কিছু ছিল না। অরণ্যচারী মানুষ তখন হিংস্রতার বশবর্তী হয়ে অন্য একরকম জীবনযাপনে অভ্যস্ত। শিকারের পিছনে ছুটত, মাংস ঝলসে খেত—গিরিগহ্বরে বাস করত। হাতে থাকত জীবনমরণের সম্বল, পাথরের এক খণ্ড হাতিয়ার। এক পাথর ছাড়া অন্য কোন জিনিসের ব্যবহার মানুষ প্রথমে শেখেনি। আগুণের ব্যবহারটুকু যা জেনেছে। সেই ৫।৬ লক্ষ বছর আগে থেকে সুরু করে গত ৮।১০ হাজার বছর আগে পর্যন্ত, কেবল ওই এক পাথরের ব্যবহারই আদিম-মানুষ করে এসেছে। যদিও সর্বপ্রথম, সম্ভবতঃ মাটিতে পড়ে থাকা কাঠের হালকা টুকরো যে সে ব্যবহার করেনি, এমন কথাও বলা চলে না। তবু বিজ্ঞানীরা মানুষের আত্মরক্ষার এই যে হাতিয়ার, তার উপাদানের নামে, প্রথম যুগসভ্যতার

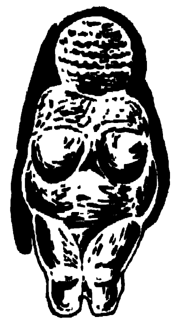


হাতের কাছে কুড়িয়ে-নেওয়া জুতসই পাথর ঘষে মেজে আদি-মানুষ তার জীবনযাত্রা সুরাহার জন্যে নানাভাবে ব্যবহার করত, তখনও যন্ত্রে যন্ত্রে এ দুনিয়া ছয়লাপ হয়ে যায় নি—যন্ত্র বলতে কয়েকখণ্ড পাথরের টুকরোকে বোঝাত

নামকরণ করেন প্রাচীন-প্রস্তর-যুগ (Palaeolithic)। আদি-মানুষের বেশীভাগ সময়ই এই পাথরের অস্ত্রশস্ত্র তৈরী করে আর ছুড়ে দিন কাটে। মানুষ তখনও তার ভাব প্রকাশের বাহন লিখিত ভাষাকে পায়নি। নিজের জীবন সংগ্রামের যুগসঞ্চিত অভিজ্ঞতা উত্তরকালের জন্যে পুরোপুরি সে রেখে যেতে পারত না। মানসলোক মারফৎ একের থেকে অন্যের ভিতর কিছু আদানপ্রদান সম্ভব ছিল না। শুধু কোনরকমে বেঁচে থাকা—এইটুকুই ছিল যথেষ্ট। কিন্তু ক্রমে পাথর কেটে মানুষ সৃজনের নতুন নতুন পথ খুলে দিল।

কৃষি-নির্ভরতায়
নতুন করে বাঁচা

প্রায় ৮ হাজার বছর আগে, যখন প্রাচীন-প্রস্তর-যুগের শেষ হয়ে আসচে ও নব্য-প্রস্তর-যুগের (Neolithic—খৃঃ পূঃ ৫০০০ থেকে ৩০০০ বছর অবধি) সূচনা হচ্ছে, এমনি এক যুগসন্ধিক্ষণে মানুষের ভাগ্যাকাশে একটা নতুন জীবনাদর্শ এসে দেখা দেয়। যা গ্রহণের ফলে পৃথিবীর উপর মানুষের অস্তিত্বের সমস্ত ভাবধারার আমূল পরিবর্তন হল। এতদিন যাযাবরী মনোবৃত্তি নিয়ে মানুষ হিংসায় মরিয়া হয়ে, শ্বাপদসঙ্কুল পথে ভ্রাম্যমানের দিনযাপন করেছে কিন্তু এখন থেকে সূত্রপাত হল একজায়গায় ঠাঁই নিয়ে বসবাস করবার নতুন জীবনযাত্রার প্রচেষ্টা। নতুন করে বাঁচা—এ শুধু সম্ভব হল কৃষি আবিষ্কারের ভিতর দিয়ে। এতে নিহিত ছিল আত্মপ্রকাশের একটা সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। আর কৃষি-নির্ভর হয়েই মানব সভ্যতার গোড়াপত্তন হল। কারণ একজায়গায় থেকে এ শুধু পৃথিবীর জমি চাষ করা তো নয়—মনের-জমিতে ফসল ফলানরও এই থেকেই সুরু। আর একথাও পণ্ডিতরা বলেন যে কৃষি আবিষ্কার নাকি কোন পুরুষ মানুষ দিয়ে সম্ভব হয়নি—এ কোন লক্ষ্মীমন্ত হাতের দান।



ধ্যানের জ্ঞানের চোখে মানুষ যা দেখে যা ভাবে তা রূপ পায় নিজের হাতের কারিগরিতে—এ পৃথিবীর প্রস্তর-যুগের নাম-না-জানা কোন শিল্পীর মনে লক্ষ লক্ষ বছর আগে যে মোহিনীমায়া রেখাপাত করেছিল, তাকে পাথরের বুকে নানা ভঙ্গিমায় রূপারোপ করতে গিয়ে মানুষকে শিল্পী হতে হয়েছে—তেমন কত বিচিত্রতর সাধনায় মানুষ আজও নিযুক্ত

যাদের এই অশেষ দানের ফলে সভ্যতার মোড় ঘুরে গেল, তাদের বোধ হয় আজও তাই কল্যাণী জ্ঞান করা হয়। কৃষিকাজ মানুষের জীবনধারণের অবলম্বন স্বরূপ হওয়ায় এখন আর খাদ্য-সংগ্রহ (Food-gathering) নয়, খাদ্য-উৎপাদন (Food-growing) করাই সবচেয়ে বড় কাম্য হয়ে দাঁড়াল। এই মূলমন্ত্র থেকেই ক্রমে জীবনযাত্রার প্রণালীতে এল স্থৈর্য, এল নির্ভরতা। প্রথম কৃষিকাজ আবিষ্কার থেকে নগর-পত্তনের আগে পর্যন্ত সময়কে নব্য-প্রস্তর-যুগ বা নিওলিথিক বলা হয়। প্রাচীন-প্রস্তর-যুগ অপেক্ষা মানুষের আত্মপ্রকাশের দিক দিয়ে এই যুগ অনেক স্মরণীয়। এই সময় ব্যবহৃত পাথরের তৈরী জিনিসগুলো আরও নিপুণ ও সুষ্ঠু বলা চলে ; শিল্প-চাতুর্যের লক্ষণও বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই সময়েই কুড়ে ঘর তৈরী সুরু হয়। ধর্ম সম্বন্ধেও ভাবনা-চিন্তা ক্রমে দানা বেঁধে ওঠে।

পাথরের পর তামা
তারপর ব্রোঞ্জ

সময় যত এগিয়েছে মানুষের জীবনধারণের প্রণালীও তত উন্নত হয়েছে। সুরু হয় পাথর দিয়ে, কিন্তু ক্রমে মানুষ ধাতুর ব্যবহার শেখে। এ শেখা তো একদিনের নয়, এ যেন একটা যুগ ধরে শেখা। প্রস্তর-যুগের পর এলো ধাতু-যুগ—প্রথমে তামার বা তাম্র-প্রস্তরের। তারপর ব্রোঞ্জের—তারপর লোহার এবং সবশেষে আধুনিক যুগ।

নিওলিথিক থেকে ব্রোঞ্জ যুগের মানব ইতিহাস খুব গুরুত্বপূর্ণ। কতকগুলো নদী-উপত্যকাকে কেন্দ্র করে তখন সব প্রাচীন সভ্যতা গড়ে ওঠে। মিশরে নীলনদের ধারে, মেসোপটেমিয়ায় ইউফ্রেটিস-টাইগ্রীস-এর ধারে, ভারত মহাদেশের সিন্ধু উপত্যকায় এবং চীনদেশের পীত নদীর ধারে। এইসব নদী-মাতৃক সভ্যতার ভিতর

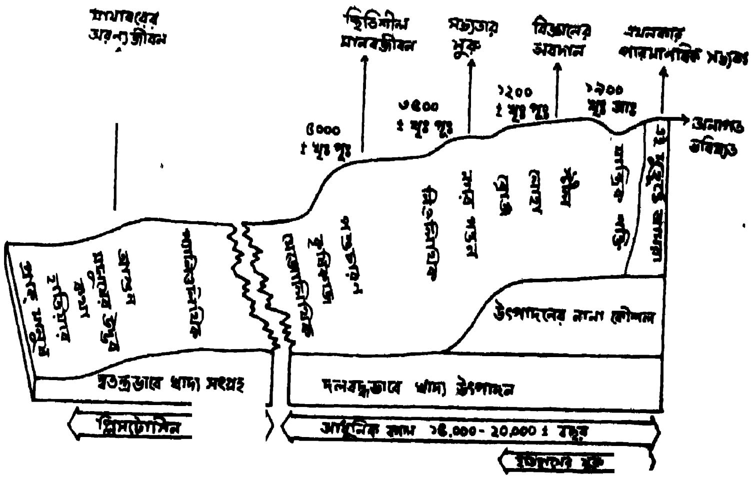
একটা নাগরিক জীবনের স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সিন্ধুনদের উপত্যকায় মহেনজোদারো ও হরপ্পার সভ্যতা প্রাগার্য ও প্রাক্‌বৈদিক সভ্যতা। এসব সভ্যতার বয়স হবে প্রায় ৪।৫ হাজার বছর। তখন জীবনযাত্রার বিস্ময়কর স্ফুরণ হয়। মহেনজোদারোর ধ্বংসাবশেষ দেখলে মনে হয়, সহরটি তৈরীর পিছনে একটা সুন্দর পরিকল্পনার ছাপ রয়েছে। তখনকার দিনের মানুষের পাকা-ইট আর জল নিকাশের জন্যে পাকা-নর্দমার কথা ভাবতে পারা কম কথা নয়। এখানে পাথরের, সোনার, তামার ও ব্রোঞ্জের তৈরী জিনিসের নমুনা দেখতে পাওয়া যায়। লোহার তখনও চল হয়নি। হাতীর দাঁতের চিরুনী, পাশা প্রভৃতি জিনিস পাওয়া গেছে। তখন শীলমোহরেরও প্রচলন হয়। এসব শীলমোহর লেখা ও রেখাযুক্ত। ব্রোঞ্জের আরসি ও ক্ষুর পাওয়া গেছে। সুতো কাটার নানান সরঞ্জাম। মাছ ধরার বড়সি ও নানারকমের মৃৎপাত্র, হাঁড়ি, কলসী, গেলাস, থালা, বাটী, চামচ—এইসব। সহরের মধ্যে চমৎকার স্নানাগার ও সন্তরণ-বাপীর নিদর্শন রয়েছে। মহেনজোদারোর সভ্যতার সঙ্গে পরিচিত হলে মনে হবে যে, জায়গাটি এমন একটি বাণিজ্য-কেন্দ্র, যেখানে নানা দেশের সঙ্গে ব্যবসার আদান প্রদান চলত।

মিশরের সভ্যতার নিদর্শন মানুষের আত্মনির্ভরতার ও বুদ্ধির জয়যাত্রার দিক দিয়ে খুব মূল্যবান। মিশরের প্রাচীন সভ্যতার সুরু প্রায় ৫।৬ হাজার বছর আগে। অনেকের মতে কারিগরি বিজ্ঞানের জন্মও সেখানে। পিরামিড দেখলে আজও বিস্মিত হতে হয়। প্রায় ২৮০০ বছর আগে ওখানকার মানুষ নির্মাণ-কৌশলের কি অদ্ভুত পরিচয় রেখে গেছে! যাদের বুদ্ধির ফলে এইসব পিরামিড জমির উপরে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের পরিকল্পনা শক্তি ও জ্যামিতিক জ্ঞান অসাধারণ বলতে হয়। মরা

মানুষকে জারিত অবস্থায় মমি করে রাখবার কৌশলও তারা জানত। এরও আগে মিশরের জ্ঞানীগুণীদের আকাশের ঠিকানা বার করার তৎপরতা প্রশংসনীয়। তাদের হাতে দূরবীক্ষণ ছিল না। তবু নক্ষত্র-লোকের অনেক খবর তারা জেনে ছিল। ৩৬৫ দিনে যে একটা বছর হয় এ কথা তাদের কাছে জানা ছিল। সূর্য দেখে সময়-নির্ণয় করবার তাদের ক্ষমতা উল্লেখযোগ্য। নানান কারিগরি জ্ঞানেরও প্রসার ঘটে। ধাতু গলান, জমি জরিপ করা, টেবিলের কাঠ জোড়া দেওয়া—এসব সহজ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। আর একটি মস্ত বড় কথা—সমস্ত যন্ত্রের প্রতীক যে চাকা, সে জিনিসটিও, মিশরের কারিগরদের মাথা থেকে তখনই বার হয়। মৃৎশিল্পের ও ধাতুশিল্পেরও প্রবর্তন তখন হয়। তখন লেখার অক্ষরের জন্ম হয়নি—ভাবপ্রকাশের জন্যে লোকেরা বুদ্ধি খাটিয়ে এঁকে এঁকে বোঝাত—হায়রোগ্লিফিক (heiroglyphic)-এর সাহায্যে। চীনদেশেও আদি-সভ্যতা খুব প্রসার লাভ করে। প্রায় ৩।৪ হাজার বছর আগে সেখানে যে নাগরিক-জীবন প্রতিষ্ঠিত হয়, এ প্রমাণ রয়েছে। কৃষিকাজ ও অন্যান্য কারিগরি কাজের প্রচলন হয়। সেই অতীতকাল থেকে সভ্যতার ইতিহাসের একটা স্পষ্ট ধারাবাহিকতার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

ব্রোঞ্জের পর লোহা
আর সেই থেকে লেখা

চিরকাল সভ্যতার পথ সর্পিল—এই দুর্গম পথের বাঁকে বাঁকে মানবসভ্যতার যে সব ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়, তাদের মোটামুটি প্রাগৈতিহাসিক ও ঐতিহাসিক, এই দুটো পর্যায়ে ফেলা চলে। আদি-প্রস্তর-যুগের উষাকাল থেকে ব্রোঞ্জযুগ—এ-সব কিছুই প্রাগৈতিহাস পর্যায়ভুক্ত। লৌহযুগ থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত



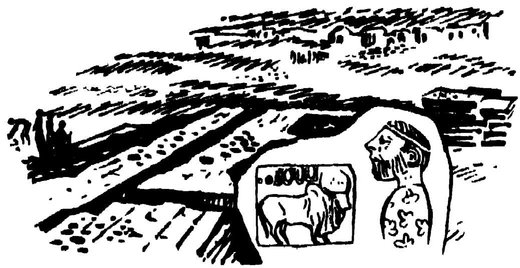
যাযাবরী-বৃত্তি ছেড়ে মানুষ কতদিন আগে স্থিতিশীল জীবনযাপনে মগ্ন হয় এবং তারপর তার ব্যবহারিক জীবনে একের পর এক যে পরিবর্তন এসেছে তার ছক

ইতিহাসের গণ্ডির মধ্যে পুড়ে। যখন থেকে লিখিত ভাষার প্রচলন হয় এবং উত্তরকালে লিখিত বিবরণের পাঠোদ্ধার করে অতীতকালের জীবন সম্পর্কে জানা যায়—সেই থেকেই ইতিহাসের চৌহদ্দি টানা হয়। লৌহযুগের সুরু আজ থেকে প্রায় ১,৪০০ বছর আগে।

লৌহ-যুগের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল লেখার ও অক্ষর বিন্যাসের উদ্ভব। ভাষার সাহায্যে মানুষ তার মানসলোককে উত্তরকালের কাছে উন্মুক্ত করে দেবার উপায় বার করল। এত-দিনের যুগসঞ্চিত অভিজ্ঞতা এবার সন্তান-সন্ততির জন্যে তুলে রেখে যাওয়া সম্ভব হল। মানুষ মরে কিন্তু তার ধ্যান-জ্ঞান সহজে মরবার নয়—কালজয়ী হয়ে তা সভ্যতা বিস্তারের পক্ষে নতুন পথ দেখাতে থাকে। ক্রমে ব্রোঞ্জের ব্যবহারের পর সহজলব্ধ লৌহধাতুর প্রচলন সুরু হয়। এই সময় ইউরোপে প্রথমে গ্রীক ও পরে রোমক সভ্যতার ব্যাপ্তি ঘটে—এই থেকেই ক্লাসিকাল কালচার-এর সুরু। সমাজে এই সময় হীন দাস-প্রথার প্রচলন হয় এবং নানান ছোট ছোট গণরাজ্যের উদ্ভব হয়। তবু জ্ঞান-বিজ্ঞানের দিক দিয়ে এই সময় কম উল্লেখযোগ্য নয়। ভারতবর্ষে বৈদিকযুগ থেকে মৌর্যযুগ পর্যন্ত লৌহযুগ বলে পরিগণিত হয়। এখানে আর্যরা এসে এক উন্নত ধরণের সভ্যতার গোড়াপত্তন করেন। বেদ, উপনিষদ রচিত হয়, পরে রামায়ণ মহাভারতের মত অপূর্ব কাব্যের জন্ম হয়। অনুমান করা হয় ঋগ্বেদের রচনা হয় খৃঃ পূঃ ৬০০০ বছর আগে। আদিকাল থেকে ভারতবর্ষে মননশীলতার ক্ষেত্রে যত সাফল্যের পরিচয় পাওয়া যায়, কারিগরি বিজ্ঞানের দিকে কিন্তু তত নয়।

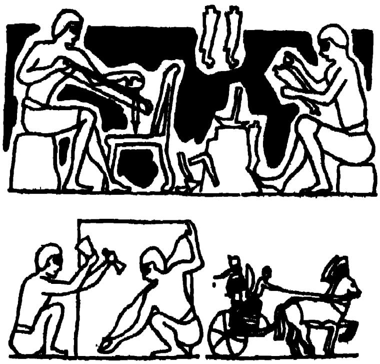
জ্ঞানের দরজায় একের পর এক করাঘাত

জীবনধারণের আপাতঃ সমস্যাগুলো মোটামুটি সামলে নিয়ে



সেই কবে যীশুর জন্মাবার ৪।৫ হাজার বছর আগে, সিন্ধুনদের ধারে মহেনজোদারোর সভ্যতা গড়ে ওঠে; সেখানকার নাগরিক জীবনের মান আজও সবাইকে বিস্মিত করে—সহরে নর্দমা, স্নানাগার, পাকা ইট, চিত্রযুক্ত শীলমোহরের প্রচলন ইত্যাদি ভাবীকালের সভ্যতার ইঙ্গিত করে

মানুষ যখন একটু থিতিয়ে বসবার অবকাশ পায়, তখন পৃথিবী সম্বন্ধে নানান কৌতূহল তার ভাবনায় চিন্তায় প্রকাশ পাওয়া স্বাভাবিক। কে আমি? কোথা থেকে এসেছি? কি আমার পরিণাম? কে এই দুনিয়াটাকে আঙ্গুলের উপর নিয়ে চালাচ্ছে? কি দিয়ে এই তাবৎ পৃথিবীর স্থাবর অস্থাবর, সব কিছু তৈরী? ততদিনে ভাষার উদ্ভব হয়েছে—জ্ঞানী-গুণীরা এই সব তত্ত্বকথা নিয়ে শুধু ভাবা নয়, লেখাও সুরু করলেন। সেই থেকেই আরম্ভ হল জ্ঞানের দরজায় ক্রমান্বয়ে করাঘাতের পর করাঘাত। খৃঃ পূঃ ৬০০ বছর আগে ইউরোপে গ্রীকদের আমল থেকে বিশ্বরহস্য সম্বন্ধে লিখিত ইতিহাস পাওয়া যায়। প্রথম যে গ্রীক চিন্তানায়কের কথা বলতে হয়, তিনি হলেন তখনকার এশিয়া মাইনর-এর প্রখ্যাত শিক্ষাকেন্দ্র মিলেটাস-এর একজন পণ্ডিত—থালিস (খৃঃ পূঃ ৬২৪—৫৪৭)। তিনি পৃথিবীর সব ঘটনাকে স্পষ্ট করে দেখতে চান এবং তাঁর সব দেখাই যে সম্পূর্ণ নির্ভুল ও বিজ্ঞানসম্মত হয় তা নয়। কিন্তু তিনিই সর্বপ্রথম দার্শনিক; সেই দিক দিয়ে তাঁর কাজের মূল্য আছে। তিনি অনেক দেশ ঘোরেন এবং নানা জ্ঞান আহরণ করেন। নভোমণ্ডলের অনেক খবর রাখতেন। এমন কি ২৮শে মে খৃঃ পূঃ ৫৮৫ সালে যে সূর্যগ্রহণ হয়, তার তিনি নির্ভুল ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারেন। সূর্যগ্রহণটা যে কোন কিছু অমঙ্গলের নয়—স্বাভাবিক প্রাকৃতিক ঘটনার ফল, এ কথাও তিনি বুঝতে পারেন। বস্তুতান্ত্রিকতা প্রবর্তনে তিনি পক্ষপাতী, কিন্তু পৃথিবী-তৈরীর-উপাদান (world stuff) সম্বন্ধে এক মহাভুল করেন। তাঁর ভ্রান্ত ধারণা ছিল যে বিশ্বসৃষ্টির মূল বস্তু হল বুঝি শুধুই জল। জলের মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে সমস্ত কিছুর ইতিকথা —এই সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কারণ। তাঁর অদ্ভুত ধারণা ছিল



নীলনদের পাশে পাশে যে মিশরীয় সভ্যতা গড়ে ওঠে তা সুপ্রাচীন—তখনকার দিনে বুদ্ধি খাটিয়ে কাঠের কাজে, জমি জরিপে ও চাকা চালান প্রভৃতি ব্যাপারে মিশরের কারিগররা যে দক্ষতার পরিচয় রেখে গেছে তার তুলনা হয় না ; মানুষের আবিষ্কারি বুদ্ধির জয়যাত্রার কাহিনী সুরু বলতে গেলে এখান থেকেই

যে সারা পৃথিবীটা বুঝি জলে ভাসছে এবং একদিন না একদিন, জলের মধ্যে ডুবে গিয়ে তার শেষ হবে। জলই পরম পদার্থ। ইউরোপে থালিস-এর প্রায় সমসাময়িক বলা যেতে পারে ভারতবর্ষের গৌতম বুদ্ধকে ; যিনি ভারতে অধ্যাত্ম মহিমার কথা নতুন করে বললেন। থালিস-এর পর আর একজন গ্রীকপণ্ডিত জন্মগ্রহণ করেন—অ্যানাক্সিম্যাণ্ডর (খৃঃ পূঃ ৬১০—৫৪৫)। জগৎসৃষ্টির মূলে কোন দেবদেবতার কথা অবতারণা না করে, পৃথিবীতে শুধু সময়ের সঙ্গে জীবনের পরিণতি এবং তার সঙ্গে জীবনের অভিব্যক্তি যে ঘটেছে, এঁর লেখার ভিতর এই বড় বৈজ্ঞানিক সত্যের আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁর এক অদ্ভুত ধারণা ছিল যে মানুষের পূর্বপুরুষদের নাকি মাছের মত দেখতে ছিল। তিনি সমুদ্রগামী নাবিকদের যাতায়াতের সুবিধার জন্যে মানচিত্র তৈরী করেন। এঁর পর আসেন অ্যানাক্সিমেনিস (খৃঃ পূঃ ৫৮৫ – ৫২৮)। থালিস জল নিয়ে যে ভুল করেন, ইনিও তেমনি, হাওয়া নিয়ে সেই ভুল করলেন। তাঁর মতে দুনিয়ার মূল পদার্থটি হল হাওয়া—সেই হাওয়ায় পৃথিবী ভাসচে। কিন্তু তিনিই প্রথম নির্ভুলভাবে ঘোষণা করেন যে পৃথিবী থেকে চন্দ্র-সূর্যের চেয়ে তারারা আরও অনেক দূরে রয়েছে। আরও বলেন যে চাঁদের নিজের কোন আলোক নেই ; সবটাই তার ধার করা আলো—সূর্যের দয়ায়।

এরপর চিন্তারাজ্যে যাঁর প্রাধান্য হয় তিনি হলেন পিথাগোরাস (খৃঃ পূঃ ৫৭২—৪৯৭)। তাঁর যুক্তি ও দর্শনের ভিতর ভারতীয় দর্শনের মুক্তিবাদের ছায়া দেখা যায়। তিনি এক বিদ্যোৎসাহী ভ্রাতৃসঙ্ঘ গড়ে তোলেন—পিথাগোরাস সঙ্ঘ। পৃথিবীর যাবতীয় ব্যাপারে তাঁরা বস্তুতান্ত্রিকতার কোন স্থান দিতে চাইলেন না—অলৌকিকতায় বিশ্বাসী ছিলেন। পিথাগোরাস-এর ধারণা ছিল, আত্মার বন্দীশালা হল এই দেহটা। কৃচ্ছ্র সাধনে আত্মার মুক্তি—



পিথাগোরাস সংখ্যার সাহায্যে বিশ্বরহস্য আবিষ্কারের কোন কিছু সুরাহা করতে না পারলেও, তাঁর বাজনায় যেদিন চড়াসুরে তারটি বাঁধলেন, সেই দিনই পদার্থ বিদ্যার প্রথম পরীক্ষাটি নিষ্পন্ন হল

transmigration of soul। তাঁর সাধনার মূলমন্ত্র ছিল, নিষ্কাম কর্মোদ্দীপনা—গবেষণার ফল প্রকাশে তিনি বিরোধী ছিলেন। কিন্তু সংখ্যাতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান ছিল অপরিসীম এবং বলতে গেলে তিনিই পদার্থবিছার গোড়াপত্তন করেন। সংখ্যার সাহায্যে ভাব-প্রকাশের এমন সব তুর্বোধ্য পরিকল্পনা করেন যা আজও বুঝবার কারুর সাধ্য নেই। অথচ, সঙ্গীতে খাদে ও নিখাদে, তারের উপর স্বরলহরীর উৎপত্তির কারণ সম্বন্ধে অকটেভ-এর কথা, তিনিই প্রথম নিঁখুত ভাবে ভাবেন। এ ব্যাপারটি তাঁর সবচেয়ে বড় বৈজ্ঞানিক অবদান। পিথাগোরাস-এর জীবনদর্শন রহস্যাবৃত এবং তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে অহেতুক ভাববাদই ছিল প্রকট। এক কথায়, তাঁর সমস্ত মতবাদ ম্যাথেমেটিক্স-এর সঙ্গে মিষ্টিসিজিম-এর এক অদ্ভুত জগাখিচুড়ী।

পিথাগোরীয় ভাববাদের
প্রত্যুত্তর

পিথাগোরাস সাধারণ জীবন থেকে সরে এসে, মঠ প্রতিষ্ঠা করে, সত্যকে জানতে চাইলেন গুহ্যতত্ত্ব হিসাবে; পৃথিবী সম্পর্কে তিনি তন্ময়তার যে ভাব দেখালেন, তার প্রত্যুত্তর আমরা দেখতে পাই এম্পিডোক্লিস (খৃঃ পূঃ ৪৯৫—৪১৪) প্রভৃতির চিন্তাধারায়। এম্পিডোক্লিস পদার্থের ভিতরকার স্বরূপটা ভাল করে জানবার কথা উল্লেখ করেন এবং বলেন, সূক্ষ্ম করে না জানলে কোন জানাই সম্পূর্ণ হয় না। শুধু হাওয়া বা শুধু জল দিয়ে কখনই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তৈরী হতে পারে না—একথা তিনি ভাল করে জানতেন। তিনি বলেন, তুনিয়ার মূলে রয়েছে অবিনশ্বর চারটি পদার্থ—মাটি, জল, আগুন ও বাতাস। এঁর পর তুজন বিখ্যাত সন্ধানী আণবিকতত্ত্বের গভীরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। তাঁরা গুরু-শিষ্য—লিউসিপপাস ও

ডিমোক্রিটাস। ভাববাদের কুহেলিকা থেকে তাঁদের ধারণা অনেক পরিমাণে মুক্ত ছিল ; স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে পৃথিবীর বস্তুপুঞ্জকে তাঁরা দেখবার চেষ্টা করেন। এই মতবাদই তাঁরা প্রতিষ্ঠা করতে চান যে, সমস্ত বস্তুর ভিতর অদৃশ্যমান খুদে খুদে বস্তু-কণিকা থাকে—পরমাণুর সমষ্টি ছাড়া এ আর কিছু নয়। কার্য-কারণ ছাড়া, কোন ঘটনা ঘটা যে সম্ভব নয়, এই সুষ্ঠু বৈজ্ঞানিক মনোভাবও তখন মূর্ত হয়ে ওঠে। ডিমোক্রিটাস-এর চিন্তার ফসলেও কিছু খুঁত ছিল—তিনি মনে করতেন, একটা নিয়তি একটা অনিবার্যতা বুঝি অমোঘ শক্তির মত পৃথিবীকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আরও আশ্চর্য, পরমাণুবাদের এই তথ্য ইউরোপের মানসে জাগার সম্ভবতঃ খৃঃ পূঃ ছশো বছর আগে ভারতবর্ষের একজন চিন্তাধর কণাদ—তিনি ভাবতে পেরেছিলেন। তাঁর মত ছিল, পঞ্চভূত দিয়ে যাবতীয় পদার্থ তৈরী। কপিল মুনি তাঁরও পূর্বে সাংখ্য দর্শনে, এই মতবাদের কাছাকাছি এসে পৌঁছেছিলেন যুক্তি ও চিন্তার পথ ধরে।

পারমাণবিক তথ্যের এমন অভাবনীয় জয়যাত্রা কিন্তু বেশীদিন স্থায়ী হল না—কারণ এর পরে প্লেটো ও অ্যারিস্টটল-এর বিরুদ্ধাচরণের ফলে মানুষের চিন্তার মোড় সম্পূর্ণ ভ্রান্ত পথে ঘুরে যায় ; যতদিন পর্যন্ত না আবার ডালটন পারমাণবিক তথ্যের পুনরুক্তি করেন। এই সময় হিপোক্রেটিস (খৃঃ পূঃ ৪৬০—৩৭৭ ? ৩৫৯) নামে একজন প্রতিভাশালী লোকের কথা জানতে পারা যায়। তিনি হলেন চিকিৎসাবিদ্যার পথিকৃৎ। চিকিৎসকদের প্রতি তাঁর উপদেশ-নামা প্রণিধানযোগ্য। মাথার খুলিতে কি করে অস্ত্রোপচার করে, সে কথাও তাঁর লেখার মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। তাঁর লেখাতে, কৌতূহলী মনের ছাপ ছত্রে ছত্রে রয়েছে। তাঁর মন ছিল যথার্থ বৈজ্ঞানিকের।

এথেন্স-এর স্মরণীয়
যাঁরা

গ্রীক আমলে যে সব চিন্তানায়কের পরিচয় আমরা পাই, তাঁদের যে প্রতিভার অভাব ছিল, মোটেই তা নয়, কিন্তু পৃথিবীকে দেখবার দৃষ্টিকোণটা ছিল তাঁদের সম্পূর্ণ অন্য ধরণের। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উপস্থিত বুদ্ধির উপর ভর করে তাঁরা বড় বড় তত্ত্বকথা বলবার চেষ্টা করতেন। নিজেদের মত প্রতিষ্ঠার জন্যে যত যুক্তির অবতারণা তাঁরা করতেন, হাতের কাছের জিনিসকে তত যাচিয়ে দেখতেন না—পরীক্ষার ধারে কাছেও আসতে চাইতেন না। গ্রীক দর্শনের এই মস্ত বড় দুর্বলতাটির কথা না মেনে কিন্তু উপায় নেই।

পুরাকালে এশিয়া মাইনর, দক্ষিণ ইটালির উপকূল ও ভূমধ্যসাগরের দ্বীপগুলিতে গ্রীক প্রাধান্য গড়ে ওঠে। ক্রমে রাজধানী সরে আসে এথেন্স-এ এবং সেই সঙ্গে জ্ঞানচর্চার কেন্দ্ররূপে এটি দেখা দেয়। এই এথেন্স নগরেই ক্লাসিকাল-সভ্যতার বিশেষ পরিণতি ঘটে। বহু স্মরণীয় দিকপালের এটি কর্মস্থান। চিন্তাজগতের অনেক খোরাক তাঁরা তাঁদের লেখার মধ্যে রেখে যান। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই বস্তুজগতের রাস্তা ছেড়ে মনোজগতের রাস্তা ধরার ফলে, বিজ্ঞানের স্বাভাবিক পরিণতির পথে নানা বাধার সৃষ্টি হয়। বাস্তব পর্যবেক্ষণ ছেড়ে ভাববাদের চত্বরে বিচরণের চেষ্টা করলে কোন কালেই কিছুতে সফলকাম হওয়া যায় না। এই সময়কার গুরু সক্রেটিস ও শিষ্য প্লেটো (খৃঃ পূঃ ৪২৮—৩৪৮), এঁদের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁরা এমন ধারণা প্রচলন করতে চান যে, মানুষের মননশক্তির সাহায্যে বিশ্বের যাবতীয় জিনিস করায়ত্ত করা সম্ভব। প্লেটো বললেন—পৃথিবীর সারবস্তু কসমস; তা শুধু চারিদিকে ছড়িয়ে

আছে তাই নয়, মানুষের মনের গহনে আত্মার সঙ্গেও মিশে আছে। আরও তিনি বললেন—পৃথিবীটা মায়া, মিথ্যা, অসত্য। তিনি অনুভূতিকে প্রাধান্য দিলেন ; আত্মার অতলতার মধ্যে ডুব দিয়েও অঙ্কশাস্ত্রের উপর তাঁর বিশ্বাস হারায়নি। প্লেটো-র বিদ্যায়তনের সামনে নাকি লেখা থাকত—'Let no one ignorant of mathematics enter here'. প্লেটো-র পক্ষে এই পৃথিবীকে মায়াময় স্বপ্নকুহেলী ভাবার পক্ষে, অথবা তাঁর অতীন্দ্রিয় ভাববাদের আতিশয্যের যথার্থ সামাজিক কারণ আজকে অনেকের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে। সেটি আর কিছুই নয়—তখনকার দিনে সমাজে দাসপ্রথা প্রচলনের কুৎসিত যে রূপ প্রকাশ পায়, সেই রূঢ় বাস্তবতা থেকে মানুষের মনকে তিনি কল্পনার আবরণে ঢেকে রাখতে চেয়েছিলেন মাত্র।

অ্যারিস্টটল-এর
অবদান

প্লেটো-র পর তাঁর শিষ্য অ্যারিস্টটল (খৃঃ পূঃ ৩৮৪-৩২২)। তাঁর ছিল অনন্যসাধারণ মনীষা এবং বিরাট প্রতিভা। প্রাণতত্ত্বের তিনি জনক। একটি জীবনের পক্ষে এত কাজ করা অন্য কোন বিজ্ঞানীর পক্ষে আজও সম্ভব হয়নি। তাঁর বিদ্যায়তনের নাম ছিল—লাইসিয়াম। এখানে নতুন জ্ঞানবিজ্ঞানের অনেক কথা, অনেক ভাবনা, অনেক চিন্তার জন্ম। তাঁর 'হিসটোরিয়া এ্যানিমেলিয়াম' গ্রন্থে, তিনি জীবজগতের নানান মূল্যবান তথ্য লিপিবদ্ধ করে যান। তাঁর বিবরণ পড়লে স্পষ্ট বোঝা যায় তিনি নানা রকমের প্রাণীর ভিতরকার প্রাণধারণ-প্রণালী সম্বন্ধে অনেক জ্ঞান অর্জন করেন। প্রাণিজগতের শ্রেণী বিভাগ বা classification-এরও তিনি উদ্যোক্তা। ভ্রূণতত্ত্বেও তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল—মুরগীর ডিমের ভিতর গঠনাকৃতির নানান পর্যায়ের কথা তিনি জানতেন। সাধারণ জ্ঞান বা পপুলার

সায়েন্স সম্বন্ধেও তাঁর নানা মূল্যবান বই রয়েছে। জীবনতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর প্রতিভা অনস্বীকার্য। কিন্তু পৃথিবী সম্বন্ধে তাঁর ধারণাগুলি মোটেই বিজ্ঞানসম্মত নয়—খুব দুর্বল এবং জায়গায় জায়গায় রীতিমত হাস্যকর। ডিমোক্রিটাস-এর পরমাণুতথ্যের তিনি ঘোর বিরোধী হওয়ায়, বিজ্ঞানে তার ফল ভাল হয়নি। তিনি ভাবতেন—জল, মাটী, হাওয়া ও আগুন ছাড়াও যে আর একটা কিছু জিনিস পৃথিবীতে আছে, যা আকাশে ছড়িয়ে থাকে—সেটা হল ঈথার। গ্রহের চলাচল সম্বন্ধে তাঁর ধারণা মোটেই বিজ্ঞানোচিত নয়। কিন্তু তবু বলতে হয়, প্রাণতত্ত্বের দিক দিয়ে তাঁর দান সামান্য নয়। আশ্চর্য, অ্যারিস্টটল-এর মত সন্ধানীর মনের তলায় তলায় প্লেটোর সৃষ্ট একটা অলীক কল্পরাজ্য বিরাজ করত যা, পৃথিবী ও প্রকৃতিকে যথার্থ বিচার করার অন্তরায় হয়ে ওঠে। জাগতিক গতি ও তার পরিবর্তনকে সত্যি বলার পথ, তাই তাঁর ছিল না।

অ্যারিস্টটল-এর পর তাঁর লাইসিয়াম-এর ভার এসে পড়ে বাগ্মী থিওফ্রেসটস (খৃঃ পূঃ ৩৭৩-২৮৮)-এর উপর। উদ্ভিদ বিদ্যায় তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল খুব। তিনি প্রাণী ও উদ্ভিদের মধ্যে প্রভেদ নির্ণয় করে যান।

আলেকজান্দ্রিয়া-য় বিজ্ঞান অনুশীলন

প্রায় তিনশো বছর ধরে গ্রীসে যে ক্লাসিকাল সভ্যতা গড়ে ওঠে, থালিস থেকে থিওফ্রেসটস পর্যন্ত, তার একটা বড় কারণ হয়তো তখনকার দিনের রাজনৈতিক স্থায়িত্ব। কিন্তু খৃঃ পূঃ ৩২৩ সালে, আলেকজান্দার-এর মৃত্যুর পর, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্থায়িত্বের অভাবে, জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চার বিঘ্ন ঘটে। আলেকজান্দার-এর বিশাল রাজত্বে তারপর ফাটল ধরে; তাঁর সেনাপতিদের মধ্যে

রাজত্ব ভাগবাঁটরা হয়। সেলুকাস-এর হাতে আসে ভারতবর্ষের সীমান্ত থেকে সিরিয়া পর্যন্ত। আর টলেমী পান সিরিয়া, মিশর ও সাইপ্রাস। টলেমী-র নেতৃত্বে আলেকজান্দ্রিয়া-য় নতুন সহর পত্তন হয় এবং এথেন্স-এর বদলে এই স্থানটি জ্ঞানবিজ্ঞানের পীঠস্থান হয়ে ওঠে। এথেন্স-এর লাইসিয়াম-এর অনুরূপ এখানে একটি বিরাট মিউজিয়াম—(Temple of the Muses) তৈরী হয়, অ্যারিস্টটল-এর ভাবাদর্শে। নানান জ্ঞানীগুণীর এখানে সমাবেশ হল। গ্রন্থাগারে প্রায় ৪০০,০০০ বই সংগৃহীত হয়। এই মিউজিয়ামটি আনুমানিক খৃঃ পূঃ ৩০০ (?) সালে নির্মিত হয়। এখানে ইউক্লিড (খৃঃ পূঃ ৩৩০-২৭৫) কাজ করেন, জ্যামিতি সম্বন্ধে তাঁর অবদান সর্বজনবিদিত। এ ছাড়া আলোকতত্ত্ব ও সঙ্গীতশাস্ত্র নিয়েও তিনি গবেষণা করেন। এই প্রসঙ্গে আর্কিমিডিস (খৃঃপূঃ ২৮৭-২১২) এর গবেষণার কথা বলতে হয়। তিনি উদস্থিতিবিদ্যা (হাইড্রোস্টাটিকস) নিয়ে মৌলিক গবেষণা করেন—যার সত্যতা আজও অটুট অবস্থায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। অঙ্কশাস্ত্রে ওঁর মত এমন দিক্‌পাল গ্রীক আমলে বড় একটা কেউ নেই। তিনি আকাশের গ্রহ-উপগ্রহের অবস্থান বিচার করে, নকল সৌরমূল বা প্ল্যানেটোরিয়াম তৈরী করতে পেরেছিলেন। এরপর জ্যোতির্বিদ্যায় পারদর্শী হিপারর্কাস (খৃঃ পূঃ ১৯০-১২০) এর কথা আমরা জানতে পারি। তিনি দূর আকাশের নক্ষত্র সারণী রচনা করেন; তারার 'উজ্জ্বলতার ক্রম' নির্ণয় করে ক্রান্তি বিন্দুর অয়ন, চলনও প্রমাণ করেন। ক্লডিয়াস টলেমীও জ্যোতিবিদ্যায় নানান গবেষণা করেন—তাঁর আবির্ভাব হয় খৃষ্টিয় ২ শতকে।

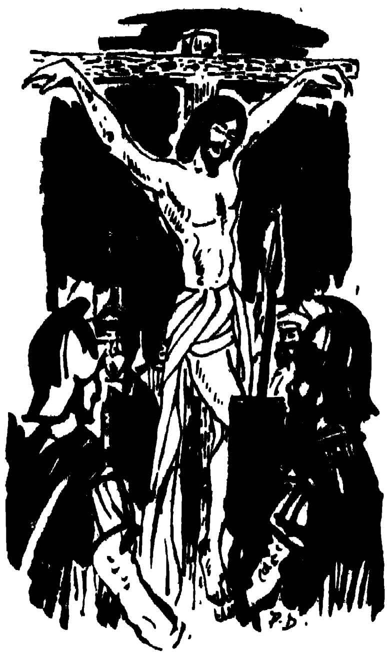
আলেকজান্দ্রিয়া-র শিক্ষাকেন্দ্র থেকে একজন যশস্বী চিকিৎসক বার হন যার নাম গ্যালন (খৃষ্টাব্দ ১৩০—২০০)। আলেকজান্দ্রিয়া-য় লেখাপড়া করে, ইনি রোম-এ চলে আসেন। রোম-এ এসে

চিকিৎসা বিষয়ে গবেষণা করে প্রচুর খ্যাতিলাভ করেন। রোম-এর এমফিথিয়েটার-এ গ্লাডিয়েটারদের যে বীভৎস খেলা হোত—সেখানে মল্লযুদ্ধে আহতদের চিকিৎসক হিসাবে গ্যালন-কে দেখতে পাওয়া যায়। ক্রমে রোম-এর উনি সবচেয়ে বড় চিকিৎসক বলে পরিগণিত হন। তিনি মানুষের মাংসপেশীর বর্ণনা ও স্নায়ুতন্ত্র সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য রেখে যান।

হেলেনেসটিক বিজ্ঞানের যে ক্ষীণ স্রোতখানি আলেকজান্দ্রিয়া-র উৎসমুখ দিয়ে কোনক্রমে প্রবাহিত হয়ে আসছিল, তাও যীশুখৃষ্ট জন্মাবার পর থেকে শুকিয়ে যাওয়ার উপক্রম হল। জ্ঞানবিজ্ঞানের কথা ভুলে, মানুষ ক্রমে ক্রমে ধর্মোন্মাদনায় জড়িয়ে পড়ল। আলেকজান্দ্রিয়া-র মিউজিয়াম হয়ে উঠল ধ্বংসোন্মুখ। বিশপ থিওফিলাস ৩৯০ খৃষ্টাব্দে এই মিউজিয়াম-এর কিছু ক্ষতি করেন। তারপর আলেকজান্দ্রিয়া যখন মুসলমানদের হাতে এসে পড়ে, তখন খৃষ্টাব্দ ৬৪০ সালে, খালিফা ওমর এই মিউজিয়াম পুড়িয়ে দিতে যান। প্রায় এক হাজার বছর ধরে আহরণ করা মানুষের জ্ঞান-ভাণ্ডারের এমনি করে পরিসমাপ্তি ঘটবে, তা কেউ কোনদিন স্বপ্নেও ভাবেনি। ধর্মের নামে, এক অদ্ভুত উন্মাদনা এসে পড়ল, স্বাধীন চিন্তা হল অবরুদ্ধ।

ধর্মান্ধতায় বিজ্ঞানের চাবি নিখোঁজ

আলেকজান্দ্রিয়া থেকে ক্রমশঃ রোম-এ সরে এলো রাজনৈতিক গুরুত্ব। কিন্তু জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চার দিক দিয়ে ইউরোপে ঘনিয়ে এলো মহা দুঃসময়—যীশুখৃষ্ট জন্মাবার ২০০ বছর পর থেকে প্রায় ১০০০ বছর পর্যন্ত। জ্ঞানগরিমার সব চিহ্ন আঁধারে ঢেকে গেল। নতুন সাধনা, নতুন চিন্তা, নতুন উদ্ভাবনের পরিকল্পনা,



কাল গুণতে খৃষ্টপূর্ব আর খৃষ্টাব্দ—যীশুর জন্মাবার আগে আর পরে। কিন্তু যে বিপাকে পড়ে তিনি প্রাণ বিসর্জন দিলেন, সেই ধর্মান্ধতাই ইউরোপে অন্ধকার ঘনিয়ে আনল এবং পাকা আটশো বছর ইউরোপের লোকেরা মুখ নীচু করে বেঁচে মরে ছিল

সব হল বন্ধ—ধর্মের বারণ, চার্চের শাসন, মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত কৌতূহলকে দাবিয়ে রাখল। আলেকজান্দ্রিয়া-র সেই বিখ্যাত মিউজিয়াম-এর অমূল্য বই সাধারণের স্নানাগারে জল গরম করবার কাজে ব্যবহৃত হল। সৃজনী-শক্তির উপর কারুর এক ফোঁটা দরদ রইল না। বিজ্ঞানের ক্রমপরিণতির পক্ষে সর্বনাশের দিন ঘনিয়ে এলো। সৃষ্টি কৃষ্টির বাঁকা পথ ছেড়ে, গোঁড়ামি ও জবরদস্তির সোজা রাস্তায়, মানুষের মনকে ঠেলে দেওয়া হল। ধর্মের অবহেলার নামে ভয় দেখিয়ে, সব কিছু থেকে মানুষকে নিবৃত্ত করা যেন সাধারণ নিয়ম হয়ে দাঁড়াল। জাগতিক ব্যাপারে যে সহজাত কৌতূহল মানুষের মনে নিত্য জাগ্রত, তা এর ফলে ধীরে ধীরে ম্রিয়মাণ হয়ে পড়াই স্বাভাবিক। গোঁড়ামির বেড়াজালে বদ্ধ মানুষ শুধু সৃষ্টিতে পরাঙ্মুখ হল তা নয়, পাকা ৬০০ বছর ধরে, তাকে কূপমণ্ডূকের জীবনযাপন করতে হয়। জ্ঞানের ক্ষেত্রে, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, ইউরোপের মানুষ এই সময় এমন কিছু রেখে যেতে পারেনি যা নিয়ে গর্ব করা চলে। সমাজে হীন দাস প্রথার অনাচার এবং মুখে ধর্মের নামে বিভীষিকা সৃষ্টি করে, সাধারণ মানুষকে অতিষ্ঠ করে তোলা হল। এই অন্ধকারের মাঝে বিজ্ঞানের চাবিকাটি গেল হারিয়ে। দুর্ভাগ্য এমনি, হাইপেটিয়া নামে একজন অঙ্কবিদকে, সমাজের শত্রু ভেবে, ঢিলিয়ে মারা হয়—তাঁর দোষ তিনি আঁক কষতেন। এই সঙ্গে বিজ্ঞানও বহুদিন মরে রইল।

ভারতে জ্ঞান-প্রদীপের আলো

ইউরোপে অন্ধকারের দিন ঘনিয়ে এলো, কিন্তু ভারতবর্ষে এবং চীনদেশে তখনও সন্ধানীরা জ্ঞানের প্রদীপখানি সযত্নে আগলে

রাখলেন। তখন খৃষ্টীয় পাঁচ-ছয়-সাত শতক। গুপ্ত আমলে ভারতবর্ষের স্বর্ণযুগ। ভারতবর্ষ ভাস্কর্যে, স্থাপত্যে, চিত্রশিল্পে অভাবনীয় পরিণতি লাভ করে। এই সমস্ত সার্থক পরিণতির পিছনে যে নির্ভেজাল বিজ্ঞান-বুদ্ধিটা কাজ করল, তাকে উপেক্ষা করা চলে না। স্থাপত্য বিজ্ঞানে কতখানি দখল থাকলে, ছশতকে অমন ইলোরায় পাহাড় কাটিয়ে শ্রীকৈলাসের মত জীবন্ত মন্দির তৈরী করা যায়, তা না দেখলে অনুমান করা কঠিন। ইলোরারও আগে অজন্তা—প্রায় খৃঃ পূঃ তিনশতকে তার সুরু। অন্ধকার গিরি-গহ্বরে পাথরের দেওয়ালকে, মেজে-ঘসে পালিশ করে, যে সব অপরাজেয় রং-ছবি আঁকা হয়, তাতে আর্ট যতই থাকুক, সায়েন্স-জানারও তা চরম লক্ষণ। সেখানকার চৈত্যবিহার আর এলিফ্যানটা, সাঁচী, সারনাথ, অমরাবতী প্রভৃতি প্রত্যেকটি জায়গার ভারতীয় স্থাপত্য বিজ্ঞানের অসাধারণ সাফল্যের পরিচায়ক! এই সময়ে ভারতবর্ষে বিজ্ঞান ও সাহিত্যের অন্য যা পরিচয় পাওয়া যায় তা খুব গৌরবময়। পাঁচ শতকে আর্যভট্ট, সাত শতকে ব্রহ্মগুপ্ত এবং বার শতকে ভাস্করাচার্যের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। আর্যভট্ট পৃথিবীতে দিনরাত্রি হওয়ার কারণ নির্দেশ করে বলেন, পৃথিবীর আবর্তনই এই ঘটনার জন্যে দায়ী। এঁদের মধ্যে ভাস্করাচার্য সবচেয়ে প্রসিদ্ধ—তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ—'সিদ্ধান্তশিরোমণি' এবং বিশেষ করে এই গ্রন্থের যে অংশ 'লীলাবতী' নামে খ্যাত তা বৈজ্ঞানিক মনোভাবের স্ফুরণের এক বিরাট সাক্ষী। অনেকে বলেন, নিউটন-এর আগে তিনিই হলেন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ। বীজগণিতেও মূল্যবান অবদান তাঁর আছে। এবং মহাকর্ষের ফলেই যে জিনিস মাটিতে পড়ে, এমন ইঙ্গিত তিনি লেখায় রেখে গেছেন। এ কথাও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ যে ভারতবর্ষের মাটীতেই প্রথম ১২৩৪৫৬৭৮৯ এরপর যে ০, সেই

পরিকল্পনাটিও এখানে হয়। অনেকের মতে, বরাহমিহিরের নক্ষত্র সম্বন্ধে জ্ঞান বিস্ময়কর ছিল। এ ছাড়া রসায়ন শাস্ত্রে আমাদের স্থান নীচে ছিল না—সোনা আবিষ্কার ভারতবাসিদের এবং লোহাও। এমন লোহার জিনিস তখন আমাদের শিল্পীরা করতে সক্ষম হয়েছিলেন, যাতে হাজার বছরেও, এতটুকু মরচে ধরতে পারে না—দিল্লির কাছে বিখ্যাত লৌহ স্তম্ভটি তার প্রমাণ। চুম্বকের ব্যবহার তখন অজানা ছিল না। বৃহৎ-সংহিতায় নানারকম গন্ধদ্রব্যের ও প্রসাধনের বিবরণ আছে।

চিকিৎসাবিজ্ঞানেও ভারতবর্ষে যথেষ্ট চর্চা এবং সাফল্য ঘটেছিল। চরক ও সুশ্রুত, এই দিক দিয়ে অমূল্য গ্রন্থ। এ সব প্রাগ্‌বৌদ্ধ যুগের গ্রন্থ—নাগার্জুন সুশ্রুতের বর্তমান সংস্করণ করে গেছেন। অস্ত্রবিদ্যা, শব-ব্যবচ্ছেদ ও সর্পদংশনের ঔষধ সম্পর্কে যা জ্ঞান আহরণ করা সম্ভব হয়, তার ফল দেশের বাইরে, বিশেষ করে মিশরে বা রোম-এ পর্যন্ত পৌঁছয়। এ কথা শোনা যায় হিপোক্রেটিস হিন্দু চিকিৎসকদের প্রভাবে এসে উদ্বুদ্ধ হন।

এ ছাড়া সাহিত্যে! ভারতবর্ষের মাটী থেকে সাহিত্যের যে মহার্ঘ্য দেওয়া হয়েছে, তার তুলনা পৃথিবীর সাহিত্যে মেলা ভার। বাল্মীকি-কালিদাসের মত কবি, শূদ্রকের মত নাট্যকার, বিষ্ণু শর্মার মত গল্প লেখক, ভর্তৃহরি-বাণভট্ট-ভবভূতির মত মরমী আর শঙ্করের মত ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসুর সংখ্যা পৃথিবীর ইতিহাসে খুব বেশী নেই। ভারতবর্ষের এমন উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায় বিখ্যাত চীনা পর্যটক হুয়েন সাং-এর ৬২৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারত পরিভ্রমণ বৃত্তান্তে।

ভারতবর্ষের উন্নতির প্রায় একই সময়ে পারস্যে, সিরিয়া ও চীনদেশেও বৈজ্ঞানিক তৎপরতা ছিল। মধ্যপ্রাচ্যে মহম্মদ এক নতুন জাগরণের সৃষ্টি করেন—তা হল ইসলাম ধর্মের অভিযান। ক্যালিপ (৯২৮-১০৩১) গ্রীক ভাষায় লিখিত জ্ঞানবিজ্ঞানের বই আরবি ভাষায়



ইউরোপে যখন অন্ধকারের দিন তখন ভারতে অঙ্কশাস্ত্রে এবং শিল্প-বিজ্ঞানে অভাবনীয় পরিণতি ঘটে—অজন্তার এমন নিখুঁত মূর্তি তৈরী করতে শুধু শিল্পবোধই যথেষ্ট নয়, সঙ্গে চাই বৈজ্ঞানিক কর্মনিষ্ঠা

অনুবাদ করেন। আর বিখ্যাত কবি ওমর খৈয়াম, তাঁর কবি সত্তার পাশাপাশি বৈজ্ঞানিক-সত্তারও পরিচয় রেখে যান—বায়োনমিয়াল থিয়োরেম ও সলিউসন অব কিউবিক ইকোয়েসন সম্বন্ধে অবদান আজও সমাদৃত। ইবন সিনা (৯৮০-১০৩৬)—যথার্থ বৈজ্ঞানিক উপায়ে রসায়নচর্চার সপক্ষে মত প্রকাশ করার মত তাঁর স্বচ্ছ দৃষ্টি ছিল।

নিয়োলিথিক থেকে প্রাক্ রেনেসাঁস পর্যন্ত, মানুষের জয়যাত্রার সবে সূচনামাত্র। সত্যি সত্যি বিজ্ঞান এসেছে রেনেসাঁস-এর পর, এবং সেই সঙ্গে মানুষের যে কি বিরাট পরিবর্তন হয় সে এর পরের প্রসঙ্গ।

রেনেসাঁস মনের বন্ধ-দরজা খুলে দিল

একদিন আধদিন নয়, সারাটা মধ্যযুগ ধরে ইউরোপে নেমে এল এক গাঢ় অন্ধকার। শতাব্দীর পর শতাব্দী, লোকগুলো চোখ চেয়ে চেয়ে যেন ঘুমিয়েছে। খোলা মন নিয়ে বাঁচার মত, এ তো বেঁচে থাকা নয়—এ যেন মরে বেঁচে থাকা। মণ্ডূক মন নিয়ে, শুধু দিন যাপন আর কাল হরণ। তখন শুধু চার্চ আর অনুশাসন; ধর্ম আর সংস্কার—চতুর্দিকে তাদের ভুরি ভুরি নিষেধ। লক্ষ রকম না-এর পেছুটান। জিজ্ঞাসায় বাদ সেধে, মনের দরজায় ছিটকিনি তুলে দিয়ে, বদ্ধমানস হয়ে যাওয়া। এরই নাম মধ্যযুগের কর্মবিমুখতা। আত্মনিগ্রহের গ্লানিভোগের আর শেষ নেই। মানুষের ভাবনাচিন্তা, শিক্ষাদীক্ষা, ধ্যানধারণার উপর একটা বড় রকমের নিশ্চেষ্টতার মোহ এসে পড়ে। মনে হল, এই সংকীর্ণতা থেকে কারও কখনও যেন আর পরিত্রাণ নেই।

কিন্তু মানুষের মন এমনি দুর্দম, যে শত কিছু 'না'র পাথর-চাপা পড়েও তা চিরতরে মরে না। সব কিছুর খোলস ছেড়ে তা বাইরে

বেরিয়ে আসতে চায়, মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলতে। সেই কারণে এল মানুষের মনে এক নতুন জাগরণ—রেনেসাঁস। এতদিনের মনের বন্ধ দরজা হঠাৎ খুলে গেল—উন্মুক্ত আলোবাতাসের মত ভীড় করে ঢুকে পড়ল নতুন ভাবনা, নতুন চিন্তা। সেই থেকেই সুরু হল নতুন যুগে নতুন করে পদক্ষেপ। এখন আর শুধু 'মানা' নয়, 'জানা'ও দরকার। ইউরোপের নবজাগরণের সূত্রপাত ইটালীতে—সেখান থেকেই দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে নবজাগরণের উন্মাদনা। ইটালীর যে দুজন এই জাগরণের উদ্যোক্তা হিসাবে আজও সম্মান পেয়ে থাকেন—তাঁরা হলেন পেত্রার্ক (১৩০৪—১৩৭৪) আর গিওভানি বোকাসিও (১৩১৩—১৩৭৫)। তাঁরা দুজনে ছিলেন কবি, রোম্যান্টিক লেখক, ভাবুক—তাঁদের দুজনার রচনা অদ্ভুত মনীষার পরিচায়ক। বোকাসিও তাঁর লেখা ডেকামেরন-এ, প্লেগ-এর ভয়ে ভীত দশজন যুবক যুবতীর মুখ দিয়ে যে সব উপাখ্যান গল্প করে শুনিয়েছেন, তার পদ্ধতি নিখুঁত এবং এমন রসোত্তীর্ণ যে, সেই সব লেখা উত্তরকালে সেক্সপীয়ারকে পর্যন্ত তা উদ্বুদ্ধ করে। আসল কথা, এই দুই মহান ব্যক্তির মানসিক গঠন ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির, তাই তাঁরা তাঁদের লেখা ও বলার ভিতরে, এক নতুন অনুপ্রেরণা সবার জন্যে নিয়ে এলেন। তখন রাজার উপরে রাজা হলেন পোপ; তাঁকে উপেক্ষা করা কারুর সাধ্য ছিল না। তবু ইটালিতেই, পোপের খোদ আস্তানায়, নতুনের আগমন প্রথম ঘোষিত হল—আগে গ্রীক-রোমক আমলে লোকে, শুধু ধর্ম-ধর্ম করেই জীবনটা কাটিয়ে দেয়নি; পৃথিবীকে দেখবার এবং জানবার নানারকম চেষ্টাও করেছে। বেঁচে থাকার একটা বড় অর্থ হল, জ্ঞানবিজ্ঞানের আরাধনা করা, জানার পরিধিকে আরও সম্প্রসারিত করে দেওয়া। এই সমস্ত কিছু পরিহার করে, ধর্মের গোঁড়ামিতে আপনাকে বিলিয়ে দিতে পারলেই, মানসিক উন্নতি

হয় না; বরং অবনতি আসে। এই কথার মর্ম উপলব্ধি করে, বাঁচবার একটা নতুন আদর্শ মূর্ত হয়ে উঠে—এ যেন নতুন জয়যাত্রার আহ্বান। এই সময় ইউরোপে আরও কজন বুদ্ধিমান লোক জন্মগ্রহণ করেন, যাঁরা এই জীবনাদর্শের অসারতার কথা বারবার সবাইকে স্মরণ করিয়ে দেন—এঁদের বলা হোত 'স্কুলমেন'। তাঁরা ধর্ম সম্বন্ধে নানান সংশয় তুলে সাধারণের মনে বিশেষ রেখাপাত করেন।

এথেন্স-এর এথেনিয়াম ও আলেকজান্দ্রিয়া-র মিউজিয়াম-এর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে, ইউরোপে বিশ্ববিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠার প্রবর্তন হল। সর্বপ্রথম প্যারিস-এ ১১৬০ সাল নাগাদ। এই থেকেই আবার নতুন করে অধ্যয়নের দীপান্বিতা সুরু হল। তারপর অক্সফোর্ড-এ ১১৬৭ সালে; কেমব্রিজ-এ ১২০৯-সালে; পাডুয়া-য় ১২২২-সালে; নেপ্লস-এ ১২২৪-সালে; ভিয়েনা-য় ১৩৬৭ সালে; এবং সেণ্ট-এনড্রুজ-এ ১৪১০-সালে। অনেকে বলেন প্যারিসে নয়, বোলোগনা-তেই নাকি প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। তখন জ্ঞান-চর্চার জন্যে কিছু অঙ্ক, কিছু রেটরিক, কিছু লজিক, কিছু মেটাফিজিক্স বরাদ্দ করা হল। আর বেশী কিছু নয়। মুখ্যতঃ, তখনও সর্বত্র অ্যারিস্টটল-এর ভাবধারাই পঠন-পাঠনের মধ্যে অক্ষুণ্ণ রইল। লোকের মনে জ্ঞান-পিপাসার নিবৃত্তির উপায় বার হল।

মধ্যযুগে ইউরোপে সামন্ততন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ফসল কাটার সময় তখন জমিদারদের যত লোক দরকার হোত তারচেয়ে কম লোকই সচরাচর পাওয়া যেত। এই চাহিদা না মেটার কারণ থেকেই পরবর্তী যুগে নানান যন্ত্র আবিষ্কারের ও প্রসারের পথ তৈরী হয়। ১১৫০ সালে ইউরোপে হাওয়াই-চাকি (wind mill) দেখা দেয়—অনেকে বলেন, এটির আমদানি হয় পারস্য দেশ

থেকে। একথা এখানে বলা প্রয়োজন আছে যে, এই চাকাকে কেন্দ্র করেই পরে ঘড়ি তৈরীর পরিকল্পনা মানুষের মাথায় আসে। এর থেকে কম্পাস-এরও প্রচলন সুরু হয়। চাকা তাই নানান যন্ত্রের প্রতীক।

১২০০ সাল নাগাদ ইউরোপে বারুদের চল হয়—সম্ভবতঃ এটির ব্যবহার চীনদেশ থেকে ইউরোপে আসে। ১৩৫০ সালে ইটালিতে প্রথম চশমার চলন হয় এবং ১৪০০ সালে চোলাই যন্ত্রের। এ ছাড়া, ১৪০০ থেকে ১৪৫০ সালের ভিতর, ইউরোপে কাগজ-ছাপাখানা চালু হয়। এগুলির ব্যবহার চীনদেশ থেকে ইউরোপে আসে। ধর্ম সম্বন্ধে সস্তা হারে বই ছাপা দিয়ে সুরু হয়, কিন্তু বই প্রকাশের সুবিধা ক্রমে শুধু ধর্মের নয়, নানান বিষয়ে প্রচারের সুবিধা নিয়ে আসে। যার ফলে লোকের মনে সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি বিষয়েও লেখার ও পড়ার উৎসাহ এল। ফলে ধর্ম সম্বন্ধে ক্রমে আগ্রহ পাঁচজনের মাঝে আপনা থেকেই কমে এলো।

কালের অগ্রদূত
লেঅনার্দো দা ভিঞ্চি

সে একদিন গেছে। ইউরোপে তখন নবজাগরণের দিন— ১৪৪০ থেকে ১৫৪০ : রেনেসাঁস। এই একশো বছর ধরে, মানুষের ঘুমিয়ে পড়া মন ধীরে ধীরে আবার জেগে উঠল। বাধা নিষেধের আওতা ছেড়ে, যুক্তির স্বচ্ছ আলোকে মন বার হয়ে আসতে চাইল—বিশ্বজিজ্ঞাসায় হল মুখর। এই সময় লেঅনার্দো দা ভিঞ্চির (১৪৫২—১৫১৯) আবির্ভাব একদিক দিয়ে খুব বিস্ময়কর। কারণ, তাঁর বিরাট প্রতিভার কথা আজ স্মরণ করলে অকুণ্ঠচিত্তে বলতে হয় যে, তিনিই ছিলেন তখনকার কালের-অগ্রদূত। এমন বিরাট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোকের জুড়ি এ পৃথিবীতে বড় একটা মেলে না। তাঁর

প্রতিভার মাপকাঠি তিনি নিজেই। যে শতাব্দীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন, সে শতাব্দীর ধ্যান ধারণা তাঁর মনকে তেমন স্পর্শ করেনি, যেমন করে ছিল আরও প্রায় তিনশো বছর পরের সব ভাবনা, চিন্তা এবং ঘটনা—যা সব আসবে। তিনি যে কালে জন্মেছিলেন, তাঁর মন সে কালকে অতিক্রম করে আরও অনেক এগিয়ে গিয়েছিল এবং অনাগতদিনের পথ খুঁজতেই তিনি সর্ব্বদা ব্যস্ত ছিলেন। কি করে এমন আশ্চর্য জিনিস সম্ভব, তা ভাবলে আজও অবাক লাগে, তবু এ কথা সত্যি যে, সেই আমলে (১৫০০ সালে) দা ভিঞ্চি উড়োযানের পরিকল্পনা করেছিলেন। শুধু কি তাই! তিনি প্রাণিজগতের শিলীভূত কঙ্কাল সম্বন্ধে যে ধারণা পোষণ করতেন, তা কেউ তখন স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। তিনি লাইফবেল্ট-এর পরিকল্পনা করেন —সাবমেরিন তৈরীর কথাও ভাবেন। আলার্ম ঘড়িও তাঁর মগজ থেকে বার হয়। মহাকর্ষ সম্বন্ধে তাঁর ধারণা নিছক ভুল ছিল না। বিজ্ঞানের সাফল্য চিন্তা করে, উত্তরকালে যন্ত্রের পর যন্ত্রের যে আবিষ্কার ও উদ্ভব হবে, তখনই তিনি সে কথা কাগজে কলমে লিখে রেখে যান। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর যে জ্ঞান এবং স্বাধীন চিন্তা ছিল, তা সত্যিই বিচিত্র। কিন্তু দা ভিঞ্চির সম্বন্ধে সমস্ত কিছু বলা অসম্পূর্ণ থেকে যায় যদি শিল্পী হিসাবে তাঁর পরিচয় না দেওয়া হয়। সবকিছুর উপর তিনি একজন অনন্যসাধারণ রূপদর্শী। 'মোনা লিসা'-র মত অননুকরণীয় ছবি তাঁরই প্রতিভার দান। এ ছাড়া আরও কত শিল্প নিদর্শন, যাদের তুলনা মেলে না। একাধারে শিল্পী, বৈজ্ঞানিক দার্শনিক ; এত গুণের সমন্বয় একজনের মধ্যে দেখতে পাওয়া বিরল। এমন দুর্লভ প্রতিভা তাঁর ছিল যে মানবজীবনের চিন্তা-ধারাকে এক নতুন দিকে মোড় ঘুরিয়ে দিলেন—দা ভিঞ্চিকে তাই বলা হয় যুগস্রষ্টা। তাঁর স্বচ্ছ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির কাছে, উত্তরকাল বহু ভাবে ঋণী।



সংস্কার-বদ্ধ মানুষের মনকে চিরাচরিতের প্রভাবমুক্ত করলেন লেঅনার্দো দা ভিঞ্চি—তাঁর দৃষ্টিতে, তাঁর পরিকল্পনায়, তাঁর সৃষ্টির মাঝে দেখা যায় ভবিষ্যতের আহ্বান—কালের তিনি যেন অগ্রদূত

আবিষ্কার আর বিস্ময়
বিস্ময় আর আবিষ্কার

রেনেসাঁস-কে কেন্দ্র করে সুরু হল আবিষ্কারের পর আবিষ্কার। যার ফলে এল, বিস্ময়ের পর বিস্ময়। দা ভিঞ্চির পর বিজ্ঞানের আবিষ্কারে যাঁর দান অবিনশ্বর হয়ে থাকবে—তিনি হলেন, নিকোলাস কোপারনিকাস (১৪৭৩-১৫৪৩)। এঁর গবেষণা এতই মূল্যবান যে, আধুনিক বিজ্ঞান দানা বাঁধতে সুরু করে কোপারনিকাস-এর তথ্য প্রকাশের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। তিনি বললেন—মোটেই সূর্য নয়, পৃথিবীটাই ঘুরচে। এতদিন পর্যন্ত তার ঠিক উল্টো ধারণাটাই চলে আসছিল—পৃথিবী থেমে আছে, আর সূর্য তার চার পাশে ঘুরছে। এ মত টলেমী-র। কোপারনিকাস বুঝতে পারলেন তখনকার জ্যোতির্বিদ্যার অজ্ঞতার কথা, এবং কতবড় দুঃসাহস দেখিয়ে, সবার বিমতে ঘোষণা করতেও কুণ্ঠিত হননি যে—পৃথিবী সূর্যকে একবার করে প্রদক্ষিণ করে আসচে, যার ফলে বৎসরের সৃষ্টি হচ্ছে। মহাশূন্যে এই পথ পৃথিবী অতিক্রম করছে লাট্টুর মত আপনার মেরুদণ্ডের চারিদিকে পাক খেতে খেতে—যার জন্যে আমরা পাই দিন আর রাত্রি—এ এক যুগান্তকারী আবিষ্কার। কোপারনিকাস অদ্ভুত এক নতুন দৃষ্টির পরিচয় দিলেন তাঁর গ্রন্থে—'রেভোলিউসন অব দি সেলেসচিয়াল স্ফিয়ারস'। আগে কেউ এমন করে উঁচুগলায় এ কথা বলতে সাহস করেনি, সবাই ভাবত, এমন কথা বললে এ দুনিয়া রসাতলে যাবে, যাবে নিজের গর্দান। মানুষের ভাবনা-চিন্তার গড্ডালিকা প্রবাহের মাঝে, বিজ্ঞানের স্বাধীন অনুসন্ধানের একজন অদ্বিতীয় মুখপাত্র হয়ে তিনি চিরকাল বেঁচে থাকবেন। তারপর এগরিকোলা-র (১৪৯০-১৫৫৫) কয়লার খনি-সংক্রান্ত গবেষণা থেকে, পৃথিবীর নীচে পাওয়া নানান ধাতুর

সম্বন্ধে জানা গেল—বিশেষ করে, বিজ্ঞান কি ভাবে শিল্পে সাহায্য করতে পারে, এঁর গবেষণা তার স্পষ্টই ইঙ্গিত দিলে।

তখনকার সমাজ কত পঙ্গু হয়েছিল তা আরও বহু ভাবে বুঝা যায়। তখন এইটেই নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, কোন কিছু পড়াতে হলে গ্রীক পণ্ডিতরা যা বলে গেছেন, সেই কথাই জোর গলায় পড়ুয়াদের শুনিয়ে দিতে হোত! তার স্বাভাবিক ফল হল, গ্রীকদের যে সমস্ত ভুল ভ্রান্তি ছিল, তা উত্তরপুরুষদের ভিতর পুরুষানুক্রমে চলে আসছিল। মানুষের শরীরের ভিতরকার গঠনাকৃতি সম্বন্ধে গ্রীকদের ধারণা মোটেই নির্ভুল ছিল না। সৌভাগ্য যে, অন্ততঃ একজন অসাধারণ লোক, সাহস করে মরা মানুষের দেহ নির্ভুলভাবে ব্যবচ্ছেদ করলেন। তিনি প্রমাণ করতে সক্ষম হলেন, এতদিন গ্রীকপদ্ধতিতে মানুষের শরীর সম্বন্ধে যে জ্ঞান বিতরণ করে আসা হচ্ছে, তা জ্ঞান নয়, অজ্ঞানের নামান্তর মাত্র। ইনি হলেন ভিসেলিয়াস (১৫১৪—১৫৬৪)। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'দি হিউমানি করপোরিস ফ্রাবরিকা' মানুষের এ্যানাটমি সম্বন্ধে, একটি অসাধারণ অবদান। সুখের বিষয়, কোপারনিকাস যে বছর তাঁর গবেষণার ফল প্রকাশ করেন, সেই বছরই ভিসেলিয়াস্-এর আবিষ্কারের কথা বই আকারে বার হয়—১৫৪৩ সালে এ পুস্তক প্রকাশনের পর থেকেই, মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ইত্যাদি সম্বন্ধে পরীক্ষা নিরীক্ষায় একটি নতুন ধারা সৃষ্টি হল। পদার্থ বিদ্যায় এই সময়কার একটি স্মরণীয় আবিষ্কার হল, গিলবার্ট (১৫৪৪-১৬০৩)-এর অবদান। তিনি ১৬০০ সালে দেখালেন, পৃথিবী একটা চুম্বক-বিশেষ এবং অনুক্ষণ এর ভিতর থেকে এর চুম্বকী-শক্তির বিকীরণ হচ্ছে। কিন্তু সবচেয়ে বড় আবিষ্কার বোধহয় বলা চলে জীবনতত্ত্বে, যা করলেন উইলিয়াম হার্ভে (১৫৭৮—১৬৫৭)। তিনি প্রমাণ করলেন যে এই দেহটা আর কিছুই নয়—একটা যন্ত্রবিশেষ। এতবড় সত্য কথাটা

আগে কেউ বুঝত না।' তিনি সবার কাছে দেখালেন যে, শরীরের ভিতর হৃদযন্ত্রের সাহায্যে রক্ত সঞ্চালন হয় বিভিন্ন প্রান্তে। এ আবিষ্কারের তুলনা নেই।

শুধু বিজ্ঞানের আবিষ্কারই বা কেন, এই সময় নতুন নতুন দেশদেশান্তরও আবিষ্কৃত হল। জানার সীমানা, অনেক অজানার প্রান্তে গিয়ে মিশল। লোকের মনে যখন জোয়ার লাগে তখন অসীম সমুদ্রে অন্বেষণের পাল তুলে, ভারি ভারি পাড়ি জমানও খুব বিচিত্র নয়। কলম্বাস (১৪৫১—১৫০৬) আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে আমেরিকা আবিষ্কার করলেন, আর ভাসকো ডা গামা (১৪৬০—১৫২৪) করলেন জলপথে ইউরোপ থেকে ভারতবর্ষের পথ আবিষ্কার—১৪৯৮ সালে তিনি কালিকটে উপস্থিত হন। এর ফলে ভারতবর্ষের সঙ্গে ইউরোপের ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার হয়। পৃথিবীর এক-প্রান্ত থেকে আর এক-প্রান্তের ব্যবধান হল সঙ্কুচিত।

বিজ্ঞানের বিপ্লবের সঙ্গে সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোরও আমূল পরিবর্তন হয়ে যায়। বেকন (১৫৬১—১৬২৬) ও ডেকার্তে (১৫৯৬—১৬৫০) বিজ্ঞানের নবলব্ধ ভাবধারায় দীক্ষিত হওয়ার সমর্থনে সাধারণের কাছে বহু ইঙ্গিত করলেন—যার মর্ম হল এই যে, ভবিষ্যত বিজ্ঞানের সপক্ষে। এতদিন সামন্ততন্ত্র চলে আসছিল, রেনেসাঁস থেকে নতুন ধরণের আর্থিক ব্যবস্থা এলো—ধনতন্ত্র। ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রসার, মানুষের মনে নতুন উদ্দীপনা, সেই সঙ্গে দেখা গেল, জনকয়েক লোকের হাতে টাকা পয়সা নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা এসে যাচ্ছে। তারাই ধনবান। বিজ্ঞানের অভ্যুদয়ের সঙ্গে ধনতন্ত্রের সম্বন্ধ জড়িয়ে আছে, কিন্তু উত্তরকালে বিজ্ঞানই স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দেয় মানুষের জীবনে ধনতন্ত্রের অসামঞ্জস্য। যার ফলে, পরে শুধু শিল্প-বিপ্লব নয়, ফরাসী বিপ্লব ও রুশ বিপ্লব সংঘটিত হয়। পৃথিবীতে সমাজতন্ত্রের প্রেরণা আসে।



গ্যালিলিও দূরবীক্ষণ হাতে দূর আকাশকে মাটিতে নামিয়ে আনলেন—আর ভয়-ভক্তি নয়। তাঁর মধ্যে আমরা দেখতে পাই নির্ভুল পর্যবেক্ষণের পরাকাষ্ঠা ; মহাশূণ্যের অনেক কথাই আর গোপন রইল না

প্রথম

বিজ্ঞানী গ্যালিলিও

একদিক দিয়ে দেখলে গ্যালিলিও গ্যালিলি-কেই (১৫৬৪-১৬৪২) প্রথম বিজ্ঞানী আখ্যা দিতে হয়। তাঁর নিজের শুধু অসামান্য আবিষ্কারের মর্যাদায় নয়, নির্ভেজাল বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির জন্যেও বটে। তাই রেনেসাঁস-এর সময়কার জ্ঞানী-গুণীদের প্রসঙ্গ তুললে, গ্যালিলিও-র কথা আলাদা করে বলতে হয়। তিনি দূর আকাশকে মাটীর পৃথিবীতে নামিয়ে আনলেন। বিশ্বলোক সম্বন্ধে তাঁর গবেষণা একান্ত মৌলিক। এতদিন ধরে আকাশ সম্বন্ধে অ্যারিস্টটল-এর ভ্রান্ত ধারণাই লোকেরা ধ্রুবসত্য বলে মেনে আসছিল। গ্যালিলিও বললেন—এ ভাবধারা বর্জন না করে উপায় নেই। তিনি কোপারনিকাস-এর মতকে জোর গলায় সমর্থন করলেন এবং বললেন—সূর্য নয়, তার চারদিকে পৃথিবীটা ঘোরে। এমন জোর গলায় এত লোকের বিপক্ষে নিজের মতকে প্রকাশ করা, সেদিনকার দিনে খুব সহজ ছিল না। তবু লক্ষ অজ্ঞজনের মাঝে একজন গ্যালিলিও-ই যথেষ্ট। তাঁর নামের সঙ্গে দূরবীক্ষণের অনেক কথাই জড়িয়ে আছে। তাঁর হাতের দূরবীক্ষণ দিয়ে আকাশটাকে নতুন করে চিনে নেবার সুযোগ হল। চাঁদের পাহাড়—তা তাঁরই প্রথম দেখা। সূর্যের ভিতরকার কলঙ্কের ছাপ (Sun spot)—এও গ্যালিলিও আবিষ্কার করেন। তিনি মেকানিক্স-এর জন্মদাতা। দোলক বা পেনডুলামও তাঁর আবিষ্কার। আশ্চর্য, এইসব নানান অনালোকিত রহস্যলোকের দরজা তিনি খুলে দিলেন, কিন্তু সেজন্য কেউ সেদিন তাঁকে অভিনন্দিত করেনি। বরং, বিজ্ঞানের সেবা তখনকার দিনে চার্চের বিরুদ্ধাচরণ মনে করা হয়, যার ফলে গ্যালিলিও-কে অনেক লাঞ্ছনা, অনেক দুর্ভোগ সহ্য করতে হয়। তবু তিনি নব্যবিজ্ঞানের একজন পথিকৃৎ হিসাবে আজও স্বীকৃত হয়ে থাকেন।

নতুন করে
পৃথিবীকে চেনালেন নিউটন

যে বছর সেক্সপীয়ার মারা যান, সেই বছরই আর একজন ক্ষণ-জন্মা পুরুষ এ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন—তিনি মহামতি নিউটন (১৬৪২—১৭২৭)। তিনি গ্যালিলিও-র যথার্থ উত্তরসাধক। তাঁর মধ্যে প্রজ্ঞার এমন অভাবনীয় স্ফুরণ ঘটেছিল, যে সমস্ত মানুষের পক্ষে তা চিরকালের এক গৌরবময় দৃষ্টান্ত। তিনি বিজ্ঞানাকাশের এক চিরভাস্বর জ্যোতিষ্ক। তাঁর গবেষণা এবং তাঁর মননশীলতা আধুনিক পদার্থবিদ্যার সিংহদ্বার রচনা করে। পরে তাঁর গবেষণার ফলে উদ্বুদ্ধ হয়ে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে, বহু উত্তরসাধক কাজ করেন। তাঁর মন ছিল সম্পূর্ণ মোহশূন্য; তাঁর পূর্বরথীদের সব অবদান তিনি যুক্তির কষ্টিপাথরে ঘষে ঘষে পরীক্ষা করে দেখেন, তার মধ্যে কতটুকু গ্রহণীয় আর কতটুকু বর্জনীয়। যেটুকু নেবার, সেটুকু তিনি নিঃসঙ্কোচে নিলেন, আর যেটুকু নেবার নয় তা বিনা দ্বিধায় পরিহার করলেন। এ জিনিস করতে গিয়ে তিনি অ্যারিস্টটল-এর মতকেও রেহাই দেননি। আর নিজে তিনি পৃথিবীর ভিতর এক নতুন নিয়মের রাজত্বের খবর পান। তাঁর চোখের সামনে আপেলটা গাছ থেকে পড়ল, আর সেই থেকেই মহাকর্ষের স্বরূপটা বুদ্ধির বৃন্তে ফুটে উঠল। ১৮৪৬ সালে তিনি অঙ্কে, আলোকরশ্মিতে এবং পদার্থের স্বরূপ সম্বন্ধে ধ্যানধারণা বদলে দেন। তাঁর লেখা 'দি ম্যাথিমেটিক্যাল প্রিনসিপ্লিল অব ন্যাচুরাল ফিলোসফি' মানুষের ধীশক্তির এক অদ্ভুত নিদর্শন। নিউটন দেখালেন, বিজ্ঞানের কথা বলতে হলে চাই অঙ্কের ভাষা—আজগুবি খেয়ালখুসীর বিলাসক্ষেত্র আর যাই হোক, বিজ্ঞান নয়। অনেক হিন্দু-শাস্ত্র-কারদের মতে নিউটন-এর আগে, ভাস্করাচার্য বার শতকে ভারতবর্ষে, ব্যাস-কলনের (differential calculus) মূল সূত্র আবিষ্কার করেন।

কিন্তু তাহলেও এই বিষয়েও নিউটন-এর অবদান অনস্বীকার্য। কোপারনিকাস ও গ্যালিলিও-র গবেষণার যথার্থ গুরুত্ব ও মর্যাদা তিনি বুঝলেন এবং সেই সঙ্গে, নিজের অবদানের ভিতর দিয়ে, তিনি পৃথিবীটাকে নতুন করে সবাইকে চেনালেন। নিউটন-এর আবির্ভাবের সঙ্গে অ্যারিস্টটল-এর দিন ফুরাল—পদার্থ বিদ্যার গবেষণার ধারা অতঃপর নিউটন-পথ-দিশারী হয়ে এগিয়ে চলল। নিউটন-এর জীবদ্দশাতেই গ্রীনউইচ-এ ১৬৭৫ সালে, রয়াল অবজারভেটরী বা মানমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়।

দিকে দিকে
বিজ্ঞানের বিস্তার

ক্রমে ক্রমে সব বাধা এড়িয়ে, সতের শতক থেকে, বিজ্ঞান শুধু প্রতিষ্ঠা পায়নি—সমাজে ভয়ভক্তিরও বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়াল। দিনে দিনে বিজ্ঞানের নানাদিকে বিস্তার ঘটে ; নিয়ে আসে অশেষ সুফল। সতের শতক বিজ্ঞানের স্বর্ণযুগ, কিন্তু আঠারো শতকও বিজ্ঞানের অগ্রগতির পক্ষে প্রশস্ত। পদার্থের স্বরূপ বুঝতে তখনকার লোকেরা অযথা 'স্পিরিট'-এর পরিকল্পনা করত—এগুলি অবান্তর হলেও, ইতিহাস প্রসঙ্গে বলতে হয়। অন্য আবিষ্কারেরও দুচারটি জলজ্যান্ত নিদর্শন আছে। ১৭১১ সালে উলভারহ্যামটন-এ নিউকোমেন 'ষ্টীম এন্‌জিন' তৈরী করেন—এটি একটি স্মরণীয় ঘটনা। জেমস ওয়াট নিউকোমেন-এর যন্ত্রটিকে আরও উন্নত করতে সক্ষম হন। পদার্থ বিদ্যায় ক্যাভেনডিস (১৭৩১-১৮১০) তাঁর গবেষণার স্বাক্ষর রেখে যান—'পজেটিভ' ও 'নেগেটিভ' চার্জ-এর অবস্থা বিশ্লেষণ করে। ১৭৮০ সালের আগে পর্যন্ত ব্যাটারির প্রচলন ছিল না। সেই বছরই বোলোগণা-তে একজন ইটালীয় অধ্যাপক—গ্যালভানি (১৭৩৭-১৭৯৮) একটি আশ্চর্য ঘটনা লক্ষ্য করেন। মরা ব্যাংএর

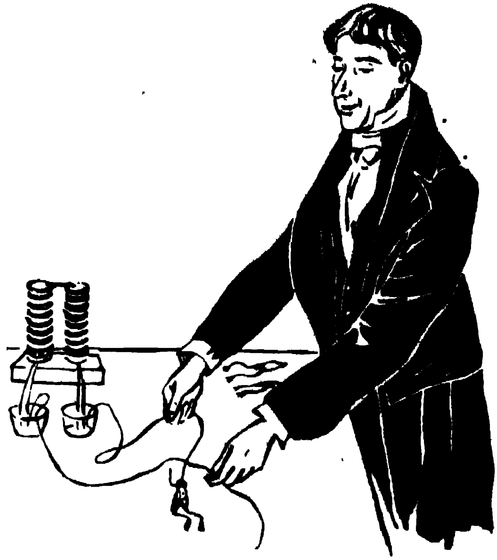


পৃথিবীতে যে একটা নিয়মের রাজত্ব আছে, সে খবর নিউটন-ই সবাইকে প্রথম জানালেন। তাঁর আবির্ভাবের সঙ্গে অ্যারিস্টটলএর দিন ফুরল ; বিজ্ঞান আর খেয়াল-খুসীর বিলাস নয়, প্রকৃতি-প্রত্যয়ের বিশ্লেষণে সূক্ষ্ম হাতিয়ার

পায়ের নার্ভটি ইলেকট্রিক তার-এর কাছে আনলে সেটি নড়ে ওঠে।

এই প্রক্রিয়া গ্যালভানিজম বলে খ্যাত। পাডুয়ার প্রফেসর আলেকজান্দ্রা ভলটা (১৭৪৫-১৮২৭) এই তথ্য নিয়ে আরও গবেষণা করে, এই ঘটনার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে সমর্থ হন। তিনি বোঝালেন—দুরকম ধাতুর সংস্পর্শের ফলে এই বৈদ্যুতিক সংঘাত। তামা ও সীসা এই দুই রকম ধাতুকে কাজে লাগিয়ে, তিনি ১৮০০ সালে বৈদ্যুতিক ব্যাটারি তৈরী করেন—এর নাম 'ভলটা পাইলস'।

আঠারো শতকে রসায়ন বিদ্যারও অনেক উন্নতি হয়, যার সূত্রপাত হেলমহোল্টজ-এর (১৫৭৮-১৬৩৪) আমল থেকেই পরিলক্ষিত হয়। তিনিই প্রথম বলেন যে, হাওয়া নানান গ্যাসের সংমিশ্রণ। তিনি গ্যাস নিয়ে নাড়াচাড়া করেন এবং জলের মধ্যে গ্যাসকে ধরে রাখার সুন্দর পদ্ধতিটি আবিষ্কার করেন। ক্যাভনেডিস সর্বপ্রথম প্রমাণ করেন যে জল বলতে আমরা যা বুঝি তা আর কিছুই নয়—শুধু হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন-এর সংমিশ্রণ। এ গ্যাসগুলির নাম তিনি অবশ্য জানতেন না কিন্তু এ আবিষ্কারের মূলে তিনি পৌঁছেছিলেন। রবার্ট বোয়েল (১৬২৭-১৬৯১) ঘোষণা করেন যে, রসায়ন-শাস্ত্র বিজ্ঞানের একটা বড় দিক—শুধু ধাতু গলান বা ঔষুধ তৈরী করার ভিতরে এর কাজ শেষ হওয়া উচিত নয়। তিনি পদার্থের মৌলিকত্ব সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান গবেষণা করেন এবং এ কথাও প্রমাণ করেন যে, প্রাণ-ধারণ করতে আমাদের নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে বাতাস শরীরের ভিতর যায়। জোসেফ প্রিস্টলি (১৭৩৩-১৮০৪) কার্বন ডাইঅকসাইড ও অক্সিজেন আবিষ্কার করেন। তারপর লাভোয়াসিয়ের (১৭৪৩-১৭৯৪)-এর হাতে রসায়নশাস্ত্রের বিরাট পরিবর্তন ঘটে এবং তা বিজ্ঞানের একখানি বলিষ্ঠ শাখায় পরিণত হয়। তাঁর দূরদৃষ্টি ছিল—তিনি বুঝতে পেরেছিলেন জীবনটা



ভোলটার হাতে মরা ব্যাঙ নাচান থেকে বৈদ্যুতিক ব্যাটারির সুরু



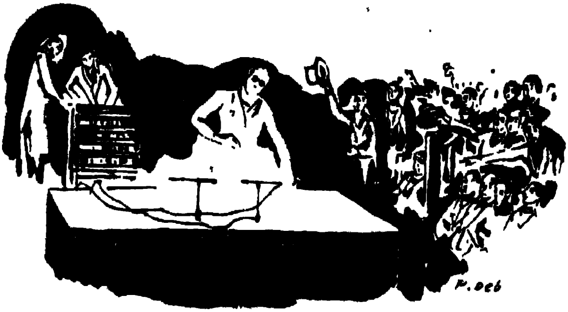
লাভোয়াসিয়ের-এর আসার সঙ্গে 'এ্যালকেমি'র শেষ আর 'কেমিষ্ট্রি'র সুরু

আর কিছুই নয়, কতকগুলো সজ্ঘবদ্ধ রাসায়নিক প্রক্রিয়া মাত্র। তাঁর বিখ্যাত উক্তি—Life is a chemical function। জীবন-রসায়ন ভাবধারার এই থেকেই সূত্রপাত। ডালটন (১৭৬৬-১৮৪৪) রাসায়নিক দ্রব্যাদি ছোট ছোট ভিন্ন ধরণের অ্যাটমের সমষ্টি, এ কথা ব্যক্ত করেন। অ্যাটমের গরুত্ব উপলব্ধির সুযোগ এলো। হামফ্রে ডেভি ১৮০৭ সালে সোডিয়াম ও পোটাসিয়াম আবিষ্কার করেন। মাইকেল ফারাডে (১৭৯১-১৮৬৭) অসামান্য গবেষণা করেন, যার প্রভাব হয় সুদূরপ্রসারী। ফারাডে প্রথমে দেখান চুম্বকী-শক্তি ধাতুর একটা সাধারণ বিশেষত্ব, আর আলোক রশ্মি হল বিদ্যুৎ-চুম্বক-তরঙ্গ। তাঁর গবেষণা ছিল সম্পূর্ণ মৌলিক ধরণের, দুনিয়াকে বুঝতে কোন ধরাবাঁধা তথ্যের আড়ষ্টতা এতে নেই—অসীমের অনুসন্ধানে এ এক গতিশীল, তাৎপর্যময় বিশ্লেষণ। ১৮০২ সালে জোসিয়া ওয়েজউড আলোকচিত্র নির্মাণের কাজ সুরু করেন সিলভার নাইট্রেট দিয়ে, আর ১৮২৫ সালে, উইলিয়াম স্টারজিয়েন সর্বপ্রথম বিদ্যুৎ-চুম্বক বা ইলেকট্রো-ম্যাগনেট প্রস্তুত করতে সক্ষম হন। এই যন্ত্রটির সাহায্যে ভবিষ্যতে টেলিগ্রাম, টেলিফোন, জেনারেটর ও মটর প্রভৃতি যাবতীয় জিনিসের উদ্ভব সম্ভব হয়। এক কথায়, মানুষের জীবনধারণের যাবতীয় ভাবধারার আমূল পরিবর্তন হয়ে যায় এই ইলেকট্রো-ম্যাগনেট থেকে।

অণুবীক্ষণ

আনল অদৃশ্যলোকের বিস্ময়

খালি চোখে আমরা কতটুকু দেখতে পাই! দূরবীক্ষণ আবিষ্কার হয়েছিল তাই রক্ষে—তা না হলে নিঃসীম শূন্যের এত গ্রহ, উপগ্রহ, তারা, তাদের ওই মিটিমিটি লাল-নীল আলো আমাদের কখনও এমনভাবে দৃষ্টিগোচর হোত না। আর কেনই বা শুধু দূরাকাশের



ডেভি আলো জ্বালালেন—শুধু ঘরের কালো দূর করতে নয় মনের অজ্ঞান-আঁধার সরাতে



ফারাডে-র বিদ্যুৎ-চুম্বক-তরঙ্গ মতবাদ যুগান্তকারী এবং সুদূরপ্রসারী হয়েছিল; এমনকি পরে আইনস্টাইন-কে পর্যন্ত তা প্রভাবান্বিত করল

সব জিনিস—নিজেদের হাতের কাছে যে সব ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সূক্ষ্ম বস্তুপুঞ্জ ছড়ান আছে, তাদের পরিচয় চিরকাল অজানা থাকত, যদি না তাদের বড় করে দেখবার উপার আর কৌশল, মানুষ আবিষ্কার করতে পারত। এবার দূরবীক্ষণ নয়, কাছের জিনিস দেখবার জন্যে আবিষ্কৃত হল অণুবীক্ষণ। এনটম ভ্যান লিউয়েনহুক (১৬৩২-১৭২৩) নামে একজন ওলন্দাজ, ঐ অদৃশ্যলোকের দরজা সবার জন্যে খুলে দেন। স্বপ্নে যা কেউ কখনও ভাবেনি, কোন কল্পনায় যা কেউ কখনও মনে আঁকেনি—লিউয়েনহুক সেই কথাই অণুবীক্ষণের তলায় বাস্তবসত্য হিসাবে সকলকে দেখিয়ে দিলেন। আরও একটা জগৎ আছে আমাদের হাতের কাছেই, সেখানে সব কিছু অনুষ্ঠিত হচ্ছে আমাদের দৃষ্টির আড়ালে, এমন নিখুঁত অথচ সূক্ষ্মভাবে যে খালি চোখে তার ধরা ছোঁওয়া পাওয়া যায় না। লিউয়েনহুক নিজের হাতে কাঁচ ঘষে ঘষে লেন্স তৈরী করেন; তাদের সাহায্যে যা কিছু দেখতে পেতেন, বড় করে তা পরীক্ষা করতেন; নিজে বড় ছিলেন তাই বোধহয় বড় করে দেখার দিকে দৃষ্টি ছিল! তাঁর জীবদ্দশায়, তিনি এমন কাঁচ ঘষে বহু অণুবীক্ষণ তৈরী করেন—একশোরও বেশী। সব কিছুই তিনি তাঁর নিজের তৈরী অণুবীক্ষণের তলায় পরীক্ষা না করে খুশী হতেন না—তা যেমন জিনিসই হোক না কেন। একটু কোন পোকার মাথা, কিম্বা উকুনের ঠ্যাং অথবা মৌমাছির হুল, এমনকি একফোঁটা শুক্র। নিজের দাঁত খুঁটেও দেখলেন অণুবীক্ষণের নিচে—হাজার হাজার ব্যাকটিরিয়া কিলবিল করছে। পচাজল তুলে এনে তার মধ্যেও তিনি ব্যাকটিরিয়ার চলাফেরা লক্ষ্য করলেন। প্রজননের ধারক শুক্রকীটদের আবিষ্কারেও তাঁর নাম জড়িত। ব্যাঙাচির লেজে অণুবীক্ষণ লাগিয়ে দেখতে পেলেন রক্ত চলাচলের অলিগলি! নানা দিক থেকে অদৃশ্যলোকের সন্ধান তিনি খুঁজে পেলেন।



দৃষ্টির অগোচরে, কিন্তু আমাদের হাতের কাছেই যে আর একটা রাজত্ব আছে, সেই অণুবীক্ষণের জগতের খবর দিলেন লিউয়েনহুক—নিজের তৈরী লেন্স-এ সব পরীক্ষা করে

অণুবীক্ষণ-গবেষণায় লিউয়েনহুক-এর সঙ্গে আরও কজন লোকের নাম করা প্রয়োজন। ইটালীর মারসেলো মালফিগি (১৬২৮-১৬৯৪) অণুবীক্ষণের সাহায্যে, রক্তপ্রবাহের ছোট ছোট ধমনী বা ক্যাপিলারি আবিষ্কার করেন। তা ছাড়া, মস্তিষ্কের স্নায়ুমণ্ডলীর উপর, দেহ-ত্বকের বাইরে ও ভিতরের ভাগ সম্পর্কে, এবং পোকামাকড়ের শ্বাসনালী বা ম্যালফিগিয়ান টিউবিউল প্রভৃতির উপর, অনেক কৃতিত্বপূর্ণ গবেষণা করেন। রবার্ট হুকে (১৬৩৫-১৭০৩) অণুবীক্ষণের সাহায্যে একটা ছিপির চোকলার মধ্যে দেখতে পান, অগণিত ছোট ছোট কুঠরি, যার নাম দেওয়া হয় সেল। জীবন্ত জিনিসের মধ্যে এই সেল আবিষ্কার কত তথ্যপূর্ণ সে কথা বেশীদিন যেতে না যেতে, আবার নতুন করে জানা গেল। এ ছাড়া জেন সোমারডাম (১৬৩৭-১৬৮০), ফ্রানসেসকো রিডি (১৬২৬-১৬৯৭ ?) অণুবীক্ষণের সাহায্যে অনেক মূল্যবান গবেষণা করেন।

এই সব আবিষ্কারের কিছুকাল পরে, সোয়ান ও শ্লেলিডেন ১৮৩৮-১৮৩৯ নাগাদ জার্মাণী থেকে ঘোষণা করলেন যে, হুকে ছিপির চোকলার মধ্যে যে সেল দেখতে পেয়েছেন—সেই রকম সেল, প্রত্যেক জীবের, কি প্রাণী কি উদ্ভিদের, ভিতর পাওয়া যায়। অর্থাৎ প্রাণিদেহ ও উদ্ভিদদেহ এমন লক্ষ লক্ষ সেল-এর সমষ্টি ছাড়া আর কিছুই নয়। দেহে নানা রকমের সেল আছে। নাকের সেল, চোখের সেল, মুখের সেল, হৃদপিণ্ডের সেল, যকৃতের সেল—নানারকম সেল দিয়ে দেহের নানা কলা বা টিস্যু তৈরী হয়। এক এক রকম টিস্যু এক বা ততোধিক প্রাণধারণের কাজ করে। অথচ খালি চোখে এই সেলগুলিকে দেখতে পাওয়া যায় না। লুই পাসতুর (১৮২২-১৮৯৫) অণুবীক্ষণের রাজত্বের, আর এক দিকে অশেষ অবদান রেখে যান। তিনি প্রমাণ করেন, আমাদের চারপাশে নানারকম বীজাণু বা জার্ম ঘুরেফিরে



পাসতুর প্রমাণ করলেন যে, আমরা চোখে দেখি না অথচ আমাদের চারিদিকে সব সময়ে ঘুর ঘুর করছে নানারকম বীজাণু—তাদের ঠাণ্ডা করতে হলে, শিশি বন্ধ করে তাদের কষে গরম করা চাই

বেড়ায় এবং তারা খুদে শয়তান বিশেষ। এদের থেকে আমাদের নানারকম রোগ হতে থাকে। এই জার্মগুলি আর কিছুই নয়—অদৃশ্য, জীবন্ত প্রাণ-কণা বিশেষ। এগুলি আকাশ থেকে উড়ে পড়ে না—একটি জার্ম থেকে অন্য জার্ম-এর জন্ম হয়। তিনি জার্ম-বিনাশের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির উদ্ভব করলেন—খুব বেশী তাপ দিয়ে তাদের মেরে ফেলা। তাদের তাপ-অসহনীয়তাই আমাদের পক্ষে মঙ্গলের কারণ—তাদের বিনাশ করার উপায় পেয়ে মানুষের অনেক রোগ ভোগ কমল। অণুবীক্ষণের সাহায্যে এমনি করে একের পর এক রহস্য অবারিত হয়ে যেতে লাগল। অবশ্য এখনও অনেক কিছুই দেখবার বাকী।

ডারউইন দেখালেন
জীবনের ধর্ম ক্রমবিকাশ

মানুষের চারিপাশে যে বিচিত্র প্রাণিসম্ভার ছড়িয়ে রয়েছে সে সম্বন্ধে মানুষ কখনই নিঃস্পৃহ নয়। অতীতকাল থেকে তাদের জানবার এবং ভাল করে বুঝবার চেষ্টার অন্ত নেই। বহু বছর আগে ধারণা ছিল, এত প্রাণী, এত উদ্ভিদ, সবকিছুই কোন এক সর্বশক্তিমানের এক একটি খেয়াল খুশীর প্রতীক। কর্তা ইচ্ছা করলেন, তাই দিকে দিকে এত বিচিত্র সব জীবনের সাক্ষী।

কিন্তু এ ধারণা টিকল না। ডারউইন (১৮০৯—১৮৮২) দেখালেন, পৃথিবীতে, আকাশে, মাটিতে ও জলে যত রকম প্রাণী আছে তারা সবাই অপরিহার্য নিয়মের এক সুতোয় বাধা—সেটা হল ক্রমবিকাশের সূত্র। ডারউইন-এর পূর্বে, লামার্ক ১৮০৯ সালে, প্রকৃতির মাঝে অভিব্যক্তির অবিরল অনুষ্ঠানটিকে দেখতে পান। কিন্তু সেই অভিব্যক্তির কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে যে সব যুক্তির



পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সত্য হল জীবনের অভিব্যক্তি। ডারউইন বললেন, কোন প্রাণীই আমাদের অনাত্মীয় নয়—সবার সঙ্গে সবার ক্রমবিকাশের ফলে যোগ আছে। আমরা এসেছি কোটি বছরের বিবর্তনের পথ ধরে; বাঁদরের আর আমাদের আদি-পুরুষ অনেক আগে ছিল এক

অবতারণা করেন, তা আজ অধিকাংশ জীববিজ্ঞানীরা মানেন না। ডারউইন-এর মতই অধিক প্রচলিত। সেই মতানুসারে, আজ আপাতঃদৃষ্টিতে প্রাণীতে প্রাণীতে যত প্রভেদই মনে হোক না কেন —বহু অতীতে তারা বিবর্তনের ভিতর দিয়ে চলে এসেছে একই পূর্ব পুরুষ থেকে উঠে, নানা রূপান্তরের পথ পরিক্রমণ করে। এমনকি মানুষেরও ক্রমবিকাশের বিরাট এক ইতিহাস আছে; মনুষ্যেতর প্রাণী থেকে যার সূত্রপাত। পৃথিবীর যা কিছুতে জীবনের সাড় আছে তাতেই ক্রমবিকাশের ছাপ আছে। ক্রমবিকাশের ঘটনা কোন বিশেষ জনকে খুশী করতে নয়—নানান আকস্মিকতার ভিতর থেকে অভিব্যক্তি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—জীবনের বিবর্তন হওয়াই যেন স্বাভাবিক ধর্ম। আর প্রকৃতির মধ্যে প্রতিনিয়ত চলেছে প্রাকৃতিক নির্বাচন—সু আর কু-কে পৃথকীকরণ। প্রাকৃতিক নির্বাচন ছাঁকনির মত ভালকে আলাদা করে বাঁচবার অধিকতর সুযোগ দেয়। এই সুযোগের সদ্ব্যবহারের ভিতর দিয়ে জীবনের অভিব্যক্তি সম্ভব হয়। সোজাসুজি মাথায় মাথায় ঠোকাঠুকি করা এ নয়; প্রকাশ্য লড়াইও নয়—বেঁচে থাকবার জন্যে প্রজননের সময় কেবল নির্বাচনের নৈপুণ্য। ডারউইন তাঁর ক্রমবিকাশ মতের ভিতর দিয়ে সময়ের সঙ্গে জীবনের ইতিহাসের যোগসূত্র দেখালেন; আর দেখালেন এ পৃথিবীতে কোনকিছুই ধ্রুব হয়ে দাঁড়িয়ে নেই—পরিবর্তনের আবর্তে সব কিছুই বদলে যাচ্ছে। প্রকৃতির হাটে পারিপার্শ্বিকতার পরিবর্তনের সঙ্গে জীবনের যে সম্বন্ধপরতা আছে, সে কথা এখন বেশ প্রাঞ্জল হয়ে উঠেছে। কোন জীবনকে অভিব্যক্তির পথে পা বাড়াতে হলে, অর্থাৎ কোন স্থায়ী পরিবর্তন আনতে হলে, তা স্ত্রী বা পুরুষ জনন-কোষের ভিতর প্রথম সংঘটিত হওয়া প্রয়োজন। রোজকার জীবনে বাহ্যিক পরিবর্তন কোনক্রমেই সুদূরপ্রসারী নয়—দেহের ভিতরে ক্রমবিকাশ ঘটানর

তার কোন সম্বল নেই। আর জনন-কোষের ভিতরের পরিবর্তন ও স্থায়িত্ব পাওয়া বা না-পাওয়া নির্ভর করে প্রাকৃতিক-নির্বাচনের উপর। অবশ্য আস্তে আস্তে এবং বহু লক্ষ বছর সময় নিয়ে এই সব ঘটনা ঘটে। সব পরিবর্তনের নবতম উন্মেষ ঘটেছে এখন মানুষের বিকাশের ভিতরে—তারাই ভবিষ্যতে পরিবর্তন বয়ে আনবার দূত।

বিজ্ঞান

মানুষের নতুন প্রেরণা

আর কিছু নয়, শতাব্দী সঞ্চিত অভিজ্ঞতা থেকে এ কথাই স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে যে বিজ্ঞান মানুষের জীবনযাত্রার পক্ষে শুধু প্রেরণা আর নয়, একমাত্র অবলম্বন হয়ে পড়েছে। বুদ্ধির কারিগরি বিদ্যা হিসাবে বিজ্ঞান জানবার চাবিকাটি তৈরী করবার কৌশল একের পর এক মানুষকে বলে দিচ্ছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে সুরু করে, জীবনের স্থায়িত্ব সন্ধান থেকে বিজ্ঞানের জন্ম, তারপর একের পর এক সভ্যতার ইতিহাসের সিঁড়ি ভেঙে এর ক্রমোন্নতি। তারপর নানান যন্ত্র আবিষ্কারের পালা—এমনি করেই সভ্যতা বিস্তারের সহায় হয়ে দাঁড়ায় বিজ্ঞান। গ্রীকদের আমল থেকে বা তারও আগে থেকে বিজ্ঞান চর্চার সুরু। রোমানরা কারিগরি কাজে তেমন পোক্ত ছিল না, তাই তাদের হাতে বিজ্ঞান তেমন ফুটে উঠতে পারে নি। ধর্মান্ধতার পর রেনেসাঁস থেকে নতুন বিজ্ঞানের জন্ম। মোটামুটি বলা চলে আধুনিক বিজ্ঞান এসেছে ১৪৫০ থেকে ১৬৯০ সালের মধ্যে। আর সেই থেকেই মানুষের জীবনযাত্রার দিন দিন আমূল পরিবর্তন হয়ে চলেছে। সতের শতক থেকে বিজ্ঞান বেশ জাঁকিয়ে বসেছে মানুষের মনে—তবু সেই দিনের বিজ্ঞানীরা শুধু গ্রীক আমলের রহস্যগুলিরই সন্ধান করবার জন্যে চেষ্টা করতে লাগলেন ফলিত গণিতের সাহায্যে। আর আঠারো শতক থেকে

বিজ্ঞান এমন এমন বিষয়ের উদ্ভব করল যা, গ্রীক আমলে কোন দিনও কেউ স্বপ্নেও ভাবেনি। এর ফলেই পৃথিবী সম্বন্ধে দৃষ্টি-ভঙ্গিরই আমূল পরিবর্তন হয়ে চলেছে। উনিশ শতক থেকে শিল্প সম্বন্ধে বিজ্ঞান নিয়ে এলো আমূল পরিবর্তনের নিদর্শন। জিজ্ঞাসার যুগ আর সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রের অভাবনীয় সাফল্য। দিকে দিকে বিজ্ঞান ছেয়ে ফেলল—ব্যবসা-বাণিজ্য, ট্রেন, স্টীমার, তার, প্রভৃতি সবকিছুই বিজ্ঞানের দান। সমাজের আসল কাঠামো গুটিকতক মানুষ নয়, সমগ্র মনুষ্য-সমাজ, এই কথাই বিজ্ঞান বিশ্লেষণ করার উপায় দেখাল। বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে সামাজিক ব্যবস্থার জন্যে কাঠামো যাতে নির্মিত হতে পারে, ১৮৬৭ সালে কার্ল মার্ক্স, তাঁর 'দা কেপিট্যাল' নামক বিখ্যাত গ্রন্থটিতে সে সম্বন্ধে আলোচনা করেন। বিজ্ঞানের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজে শ্রম-নিরত আর শ্রম-বিমুখ লোকের মধ্যে অর্থনৈতিক পার্থক্য ক্রমে প্রকট হয়ে উঠল, সে জটিলতা থেকে মুক্তি পাওয়ার পথ বিজ্ঞানই দেখায়। কিন্তু এই শেষ নয়—তারপর, আরও পর আছে—বিশ শতকে বিজ্ঞান যে কতখানি কি করেছে, তার নিদর্শন খুঁজতে গেলে দেখতে হবে আমাদের আজকের জীবনযাত্রার পরিণামের ভিতর।

বুদ্ধির জয়যাত্রার সঙ্গে জানবার নতুন নতুন চাবিকাঠি তৈরী

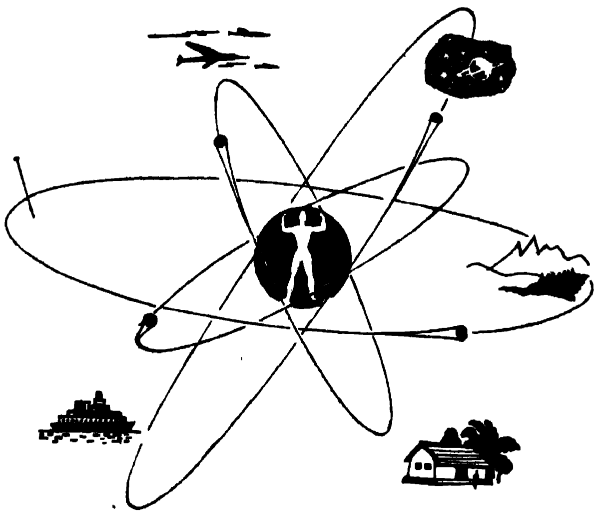
খৃঃ পূঃ ১০০০০০ থেকে ৫০০০ —	ভ্রাম্যমাণের জীবন, পাথরের ব্যবহার, আগুনের প্রচলন, অবলম্বন শিকার
খৃঃ পূঃ ৫০০০ থেকে ৩০০০ —	কৃষি-আবিষ্কার—নতুন করে বাঁচা, প্রাচীন সভ্যতার উদ্ভব, লাঙ্গল, মাটির হাড়িকুড়ি, তাঁতবোনা, তীর-ধনুক
খৃঃ পূঃ ৩০০০ থেকে ৬০০ —	ধাতুর প্রচলন—তামা, ব্রোঞ্জ; জল সেচ করার ও জল তোলার উপকরণ, চাকাযুক্ত গাড়ি, রাস্তা, ঘোড়ার ব্যবহার; ইট-ঘর, চেয়ার-টেবিল, মুদ্রা
খৃঃ পূঃ ৬০০ থেকে ১ বছর —	লোহা, কাচ—লেখার প্রচলন। ঔষধ পত্তরের চল, সমুদ্রগামী জাহাজ নির্মাণ; নানান চিন্তার স্ফুরণ—থালিস থেকে অ্যারিস্টটল; ভারতে গৌতম বুদ্ধ—আলেকজান্দ্রিয়া-র মিউজিয়াম
খৃষ্টের জন্ম ০ বছর —	খৃষ্টধর্ম; প্লিনির বিশ্বকোষ, টলেমী-র পৃথিবী পরিচয়
খৃঃ অঃ ২০০ থেকে ১০০০ —	ইউরোপের অন্ধকারের যুগ—ভারতে স্থাপত্যে, সাহিত্যে, বিজ্ঞানে সুসময়—অজন্তা, ইলোরা সাঁচীর মত কীর্তি; আর্যভট্ট, ব্রহ্মগুপ্ত, কালিদাস, ভবভূতির মত বিদগ্ধজন
খৃঃ অঃ ১০০০ থেকে ১৪৫০ —	পাতন-যন্ত্র, কাগজ, কম্পাস, বারুদ, চশমা, কামান, নানারকমের তেল রং করা ছবি
খৃঃ অঃ ১৪৫০ থেকে ১৫৫০ —	ইউরোপে নব জাগরণ—রেনেসাঁস। কলম্বাস ও ভাসকো ডা গামা-র নতুন নতুন দেশ আবিষ্কার, লিওনার্দো-র এনাটমি ও আর্টএ নতুন দৃষ্টি, কোপারনিকাস-এর কথা-সূর্য নয়, পৃথিবীই ঘূর্ণায়মান, নানান বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন
খৃঃ অঃ ১৫৫০ থেকে ১৬৫০ —	বিজ্ঞানের স্বপক্ষে বেকন ও ডেকার্তে, গিলবার্ট-এর চুম্বক শক্তি, গ্যালিলিও-র টেলিসকোপ, নিউটন-এর মহাকর্ষ, লিউয়েনহুক-এর অনুবীক্ষণ, হার্ভে-এর রক্ত সঞ্চালন, অবিশ্বাসকর সব আবিষ্কার, বিজ্ঞান সুপ্রতিষ্ঠিত
খৃঃ অঃ ১৬৫০ থেকে ১৭৬০ —	ষ্টিম-এনজিন আর শিল্প বিপ্লব, ল্যাভয়াসিয়র-এর অবদান
খৃঃ অঃ ১৭৬০ থেকে ১৯০০ —	ডালটন-এর অ্যাটম, ডারউইন-এর অভিব্যক্তিবাদ, মার্কস-এর সাম্যবাদ, পাসতুর-এর বীজাণু শোধন পদ্ধতি



অ্যাটমের খেলা

আলপিন থেকে হিমালয় সব
কিছুই অ্যাটমের তৈরী

এ দুনিয়ার খেলাঘরে সকাল থেকে রাত্রি অবধি আমরা কি খেলাই না খেলছি! জীবন নিয়ে যত সব পুতুলখেলা। সব-কিছু এখানে বাস্তব-মুখরতায় মন্দ্রিত। বৈচিত্র্যে অনন্য। আমরা কত কি না কানে শুনছি, চোখে দেখছি, হাতে স্পর্শ করছি! বিস্ময়বিহ্বল মনের আশ মেটে না। আকাশের মিটি মিটি তারা। ট্রামগাড়ির ঘর্ষণ। উদয়াস্তে আকাশে রঙ-ছড়ানোর মেলা। মেঘের গম্ভীর রোল। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দাহন। ঝড়-ঝঞ্ঝা। ফুলের সুবাস। বাতাসের মৃদু স্পর্শ। দিগন্তের শ্যামলিমা। মরুভূমির রুক্ষতা। সমুদ্রের অশ্রান্ততা। তুষারমৌলির নিথরতা। এ সব-কিছু সম্পূর্ণ ততক্ষণ, যতক্ষণ এই রক্তমাংসের শরীরটা নিয়ে আমরা বেঁচে থেকে সব-কিছু জানছি আর অনুভব করছি। তা না হলে সবই নিরর্থক। সপ্ত সিন্ধু দশ দিগন্ত ব্যাপ্ত করে শুধু বস্তু আর বস্তু—পৃথিবীর কিউরিও-শপে কত রঙ্গে-ভঙ্গে তারা সাজানো, কোনটা মহার্ঘ্য কোনটা মূল্যহীন। পরিদৃশ্যমান জগতের যাবতীয় জিনিস, যারই কিছু ওজন আছে, যা কিছু জায়গা দখল করে থাকে তাকেই বলা হয় পদার্থ। হয় তা

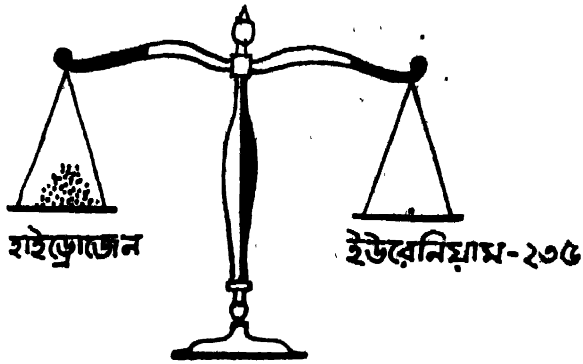


এ পৃথিবীতে এমন কিছু নেই যা অ্যাটম দিয়ে তৈরী নয়; কোন কিছু হলেই তাতে অ্যাটম থাকবে, হোক না তা আলপিন কি হিমালয়; আকাশের মিটিমিটি তারা, অতলান্তিক সমুদ্র, নদী নির্ঝর—সব কিছুর গুণ-নিধি ওই অ্যাটম

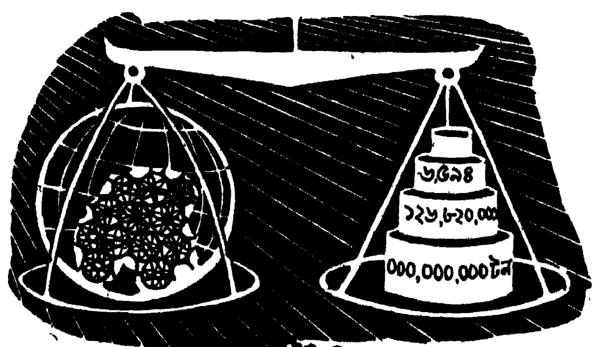
জীবন্ত, নয় তা নির্জীব। বিশ্বসংসারে জিনিস কি একটা দুটো? হাজার লক্ষ রকমের। গুণে শেষ করা যায় না, বিস্ময়েরও অবধি নেই। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হল, যত রকমই জিনিস যেমন ভাবেই আমরা দেখতে পাই না কেন, যেখানেই দেখি না কেন—নিঃসীম আকাশে, কি ৫৭৫,১০,০০০ বর্গমাইল এই ধরাপৃষ্ঠে, কি ১৩,৯৪,৪০,০০০ বর্গমাইল এই সমুদ্রের নীচে, আসলে কিন্তু মাত্র ৯২টি (এখন এই সংখ্যা যদিও ক্রমবর্ধমান) খোদ-জিনিস থেকেই পৃথিবীর এই বিচিত্র বস্তুসম্ভারের উদ্ভব। বিরানব্বই রকমের মূল জিনিস, মানে তারাই মৌলিক পদার্থ। প্রতিটি পদার্থ তৈরি আবার পরমাণু দিয়ে। পৃথিবীর ছকে এই বিচিত্র রকমের পরমাণুরাই যেন দাবাবোড়ে। তারা নানা ভাবে নানা সমাবেশ সৃষ্টি করে যত রকম পদার্থ তৈরি করেছে। পরমাণু হল অ্যাটম, আর তার সংহতি হল মলিকিউল বা অণু। বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের পরমাণুরা মিলে সৃষ্টি করে নানান যৌগিক পদার্থের অণু। বর্তমানের পরমাণু-তত্ত্ব এখন ডালটন-যুগের অ্যাটমের অনবিভাজ্যতাকে মানেনা, আরও অনেক সূক্ষ্মভাবে পদার্থকে বিচার করতে শিখেছে। বিশ্বকে বিভাগ করতে গিয়ে আর শুধু জল বা শুধু হাওয়া দিয়ে তা তৈরী, এমন কথা কেউ ভাবে না—সব-কিছুর মূলে যে অ্যাটম রয়েছে, সেই কথাই সত্যসন্ধ মন নিয়ে যাচাই করার সময় এসেছে।

সবচেয়ে হালকা হাইড্রোজেন
সবচেয়ে ভারী ইউরেনিয়াম

এ দুনিয়ায় সবচেয়ে হাল্কা পরমাণু হল হাইড্রোজেন-এর পরমাণু। একটি হাইড্রোজেন-পরমাণুর ওজন প্রায় এক গ্রামের দশ কোটি ভাগের একভাগ। আর সবচেয়ে ভারী পরমাণু হল ইউরেনিয়াম-এর। তার একটি পরমাণুর পারমাণবিক ওজন হল



সবচেয়ে হালকা পরমাণু হাইড্রোজেন আর সবচেয়ে ভারী ইউরেনিয়াম-এর ;
এই বাঁ আর ডানের মাঝে আরও নব্বুই রকমের পরমাণু রয়েছে



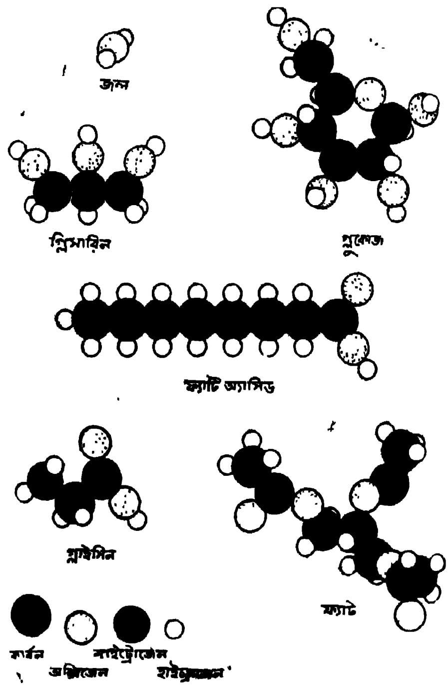
আমাদের এই পৃথিবীটাও নানারকমের অ্যাটম দিয়ে তৈরী—তেমন কোন বড় দাঁড়ি পাল্লায় তুললে দেখা যাবে এর ভিতর যত অ্যাটম আছে, তাদের সব মিলিয়ে ওজন দাঁড়িয়েছে ৬,৫৯৪, ১২৬, ৮২০, ০০০, ০০০, ০০০, ০০০, টন

২৩৮। এই হাইড্রোজেন আর ইউরেনিয়ামের মধ্যে আরও নব্বই রকমের মৌলিক পদার্থের সন্ধান পাওয়া গেছে, যাদের পারমাণবিক ওজন ক্রমে ক্রমে বেড়ে গেছে। হাইড্রোজেনের পর হিলিয়াম, তারপর লিথিয়াম, বেরিয়াম, বোরন, কার্বন ইত্যাদি। এর ভিতর লোহা, সোনা, তামা, পারা, সীসা—এসবও এসে পড়ে।

বিভিন্ন রকমের পরমাণুরা জাতে ও স্বভাবে এক রকম নয়। ওজনে ও স্বভাবে কারুর সঙ্গে কারুর মিল নেই। এ বিভিন্নতা এদের মৌলিক। তাই এক ঘটি সোনার সঙ্গে এক ঘটি লোহার ওজন কখনও এক হয় না। সোনা সব সময়েই লোহার চেয়ে ভারী। বিভিন্ন রকমের সব পরমাণুরা আবার নানা রকম ভাবে মিশে নানান পদার্থের সৃষ্টি করে। প্রায় ক্ষেত্রেই পরমাণুরা নিজেরা স্বতন্ত্রভাবে থাকে না। দুটি বা ততোধিক পরমাণু সমাহারে আণবিক অবস্থায় থাকে। যৌগিক বা মৌলিক পদার্থ যাই দেখি না কেন, তা হল সঙ্ঘবদ্ধ অণু। ১৮৬৯ সালে মেনডেলিফ এ পৃথিবীতে মোট ৯২টি মৌলিক পদার্থ আছে ভেবে তাদের পর্যায়সূত্রে সাজিয়ে যান, তারপর কিন্তু আরও কতকগুলির সন্ধান পাওয়া গেছে যা আগে জানা ছিল না। যেমন ৯৩ নম্বরের নেপচুনিয়াম ও ৯৪-এ প্লুটোনিয়াম। এদের প্রকৃতির ভিতর স্বাভাবিকভাবে পাওয়া যায় নি, ল্যাবরেটোরীতে ইউরেনিয়াম-এর ওপর নানান প্রতিক্রিয়ার ফলে পাওয়া যায়।

অ্যাটমদের
জাতি-ধর্ম গোত্র-বর্ণ

বস্তুর প্রকাশের ভঙ্গি তিন রকম—কঠিন, তরল ও বাষ্পীয়। এই তিন রকম আকার ছাড়া অন্য কোন আকারে বস্তু থাকতে পারে না। যেমন জল। কখনও ঠাণ্ডায় জমে কঠিন বরফ, কখনও



ভিন্ন ধরণের সব অ্যাটম বা পরমাণু সমাহারে নানান রকম মলিকিউল বা অণুর সৃষ্টি হয়; ২টি হাইড্রোজেন, ১টি অক্সিজেন পরমাণুর সঙ্গে মিলে জল তৈরী করে, তেমনি ৬টি অক্সিজেন, ৬টি কার্বন, ১২টি হাইড্রোজেন দিয়ে গ্লুকোজ, এমনি ধারা আরও কত বিচিত্র সমাবেশ

বা তরল শীতল পানীয় জল, অথবা উত্তপ্ত হয়ে বাষ্পাকারে উবে যাচ্ছে। এ ছাড়া জলের অন্য কোন আকার থাকতে পারে না। জল হল যৌগিক পদার্থ। হাইড্রোজেনের দুটি পরমাণুর সঙ্গে অক্সিজেনের একটি পরমাণু মিলে গিয়ে জলের একটি অণু তৈরি হয়েছে। আমরা একটি অণু দেখি না। দেখি অজস্র অণুর সমাহার।

সকালে বিকালে চায়ে যে চিনি খাই, তাও একটি যৌগিক পদার্থ—বারোটি কার্বন, বাইশটি হাইড্রোজেন ও এগারটি অক্সিজেন পরমাণুর সংযোগে চিনির প্রত্যেকটি অণুর সৃষ্টি হয়েছে। অণুর জন্যেই পরমাণুদের ঘর বাঁধা। এই ভাবেই পদার্থের বিভিন্নতা সৃষ্টি করা। উডপেন্সিল থেকে চন্দনকাঠ দুইই নানান পরমাণুর বিচিত্র পরিস্থিতি, সেই গুণেই নানান অণুর উদ্ভব। চমচম আর টমটম—দুটোতেই ম থাকলে কি হয়, আসলে তারা যে সর্বতোভাবে বিভিন্ন, তার মূলে তাদের অণুপরমাণুর অন্তর্নিহিত প্রভেদ। এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে, এ পৃথিবীতে যা কিছু দেখছি তারা অণু ও পরমাণুর সমষ্টি ছাড়া আর কিছুই নয়। ধরাপৃষ্ঠকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, সেখানেও কতকগুলি মৌলিক উপাদান রয়েছে—শতকরা হিসাবে অক্সিজেন—৪৭%, সিলিকন—২৮%, এলুমিনিয়াম—৮%, লোহা—৫%, ক্যালসিয়াম—৩·৫%, সোডিয়াম—২·৫%, ম্যাগনেসিয়াম—২%, পোটাসিয়াম, অঙ্গার, ক্লোরিন প্রভৃতি—২·৫%। টেবিলের পিনকুশনে গোঁজা ছোট্ট আলপিনটা থেকে সুরু করে আকাশের গায়ে হেলান-দেওয়া নগাধিরাজ পর্যন্ত অ্যাটমেরই তৈরি—তাদের বিভিন্ন গঠনবৈচিত্র্য আর আপন আপন বৈশিষ্ট্যে তারা স্বতন্ত্র। রাসায়নিক ধর্ম, বর্ণালি আর ইলেকট্রনের সংখ্যা দিয়ে বিভিন্ন রকমের অ্যাটমের জাত নির্ণয় করা হয়ে থাকে।

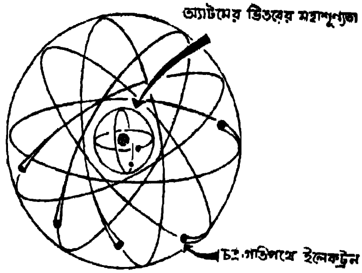
ইলেকট্রন-প্রোট্রন-নিউট্রনের দানাদার

বাইরে থেকে যে কোন জিনিস যত বড়ই দেখাক না কেন, দেখা যাচ্ছে আসলে কিন্তু ভিতরে তা লক্ষ কোটি অ্যাটমের সমষ্টি। সব জিনিসই ভাঙতে ভাঙতে এসে পৌঁছয় অ্যাটমে। অ্যাটম শব্দের উৎপত্তি—'অ্যা' অর্থে না; 'টম' হচ্ছে ভাঙা। না-ভাঙা যায় যা, তাই অ্যাটম। আংশিক সত্যতা মেনে নিয়েই এক কথায় বলতে হয়, যে কোন জিনিসের শেষতম বিভাজ্য অংশ হল অ্যাটম। হাওড়া ব্রীজটার এত বড় জাঁদরেল চেহারা, কিন্তু তাকেও খুলতে খুলতে আস্তে আস্তে এসে পড়তে হয় স্ক্রু, বল্টু, জয়েন্ট, বিম, এই সব নানান রকম সাজসরঞ্জামে। প্রত্যেকটি সরঞ্জাম বাইরে থেকে দেখতে ছোটই হোক আর বড়ই হোক, আসলে তারা নিজেরা লক্ষ কোটি অ্যাটমের সমষ্টি।

কিন্তু এ কথা এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে, অ্যাটম বা পরমাণুই বস্তুর শেষ কথা নয়। অ্যাটমের মধ্যে আরও কিছু জিনিস আছে, যাদের কথা এবার বলতে হয়। এক একটি অ্যাটম হল একটা দানাদার-বিশেষ, যার মধ্যে ইলেকট্রন, প্রোটন আর নিউট্রন মজুত আছে। তা হলে এই পৃথিবীর যাবতীয় স্থাবর জঙ্গম জিনিসের শেষ কথা হল, তারা অ্যাটম দিয়ে তৈরি হলেও, প্রত্যেকের শেষতম অবিভাজ্য কণিকা হল ইলেকট্রন, প্রোটন আর নিউট্রন। অতএব কথাটা সোজা করে বলতে গেলে বলতে হয়, বস্তুর ভিতর ইলেকট্রন, প্রোটন আর নিউট্রন এই তিন রকম জিনিসই আছে। তারাই সব কিছুর মূল বনিয়াদ।

একটা অ্যাটম এত ছোট যে, খালি চোখে তো দূরে থাক, এমন কি কোনরকম শক্তিশালী অণুবীক্ষণের নীচেও আমরা দেখতে পাই না। ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রনদের অবস্থিতির সঠিক

প্রমাণ পাওয়া গেলেও, তাদের সোজাসুজি চোখাচোখি করে দেখতে পাওয়া সম্ভব হয় নি। অবশ্য তারা কি করে এবং কেমন করে রয়েছে, এই সব তত্ত্বের নির্ভুল গণনা সম্ভব হচ্ছে। একটি অ্যাটমের ব্যাস এক সেন্টিমিটারের পাঁচ কোটি ভাগের এক ভাগ। তার মধ্যে আবার রয়েছে ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন। অ্যাটমের নিজের কোন তড়িৎ বা বিদ্যুৎ-শক্তি নেই, তা বিদ্যুৎ-নিরপেক্ষ। কারণ একটি অ্যাটমে সমান সংখ্যার ইলেকট্রন আর প্রোটন থাকায়, তারা নিজেদের ভিন্নমুখী সমপরিমাণের চার্জকে 'নিউট্রালাইজ' (স্বভাবতঃই কাটাকাটি) করে দেয়। নিউট্রনরা নিরপেক্ষ; কোন বাদ-বিসম্বাদের মধ্যে না থেকে, অ্যাটমকে শুধু তাদের ওজনটুকু ধার দিয়েছে। অ্যাটমের মর্মানুসন্ধান করলে জানা যায়, প্রত্যেকটি অ্যাটমের দুটি ভাগ আছে—বাইরের দিক ও একটি কেন্দ্রমুখী ভিতরের দিক। ইলেকট্রনরা বাইরেই থাকে। আর প্রোটন ও নিউট্রনরা থাকে কেন্দ্রে। প্রোটন ও নিউট্রনদের মিলিতভাবে বলা হয়ে থাকে নিউক্লিয়ন এবং তাদের অবস্থান-কেন্দ্রকে বলা হয় নিউক্লিয়াস। ইলেকট্রন নেগেটিভ-চার্জ-যুক্ত, সদাসর্বদা তা নিউক্লিয়াস-এর চারদিকে দুরন্ত চক্রগতিতে প্রদক্ষিণ করে চলেছে। বিভিন্ন রকম অ্যাটমের মধ্যে ইলেকট্রনদের ঘুরন্ত গতিবেগের প্রভেদ দেখা যায়। একটা অ্যাটমের যা-কিছু ভর তা দেখা যায় কেন্দ্রে। ইলেকট্রনদের ওজন এত নগণ্য যে তা অগ্রাহ্য করা চলে। তা হলে একটি পরমাণুর যে ভর, তার মূলে আছে নিউট্রন আর প্রোটনদের মিলিত ওজন (প্রায় সমানই—নিউট্রনের সামান্য বেশী)। হাইড্রোজেন অ্যাটমে একটি ইলেকট্রন প্রোটনের চেয়ে ১৮৫০ গুণ হালকা।



একখানি অ্যাটম যেন ছোট্ট একটি সৌরজগৎ, বাইরে চক্রগতিপথে 'না'-ধর্মী ইলেকট্রন আর ভিতরে 'হাঁ'-ধর্মী প্রোটন—নিউট্রন-এর চার্জ নেই; সব মিলিয়ে অ্যাটম বিদ্যুৎ-নিরপেক্ষ—অ্যাটমের ভিতরেও মহাশূন্যতার সন্ধান পাওয়া গেছে

অ্যাটমদের

অন্দরমহলের বিভিন্নতা

এখন সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, ইলেকট্রন ও প্রোটনের সংখ্যার তারতম্যে পরমাণুর মৌলিকত্ব নির্ভর করে। আগেই বলা হয়েছে যে, পৃথিবীতে ৯২ রকমের মৌলিক পদার্থ আছে এবং এই ৯২ রকমের পদার্থের পরমাণুরাও ৯২ রকমের। এদের প্রত্যেকটি পরমাণু বা অ্যাটমের অন্দরমহলের বৈশিষ্ট্যও ভিন্নতর। এর মধ্যে সবচেয়ে সাদাসিধে ভিতরকার ব্যাপার হল হাইড্রোজেন-পরমাণুতে। কারণ হাইড্রোজেন-পরমাণুতে মাত্র একটি ইলেকট্রন ও ভিতরে একটি প্রোটন আছে। এখানে নিউট্রন নেই, যেমন অন্যান্য পরমাণুর বেলায় থাকে। বর্তমান বিজ্ঞানে হাইড্রোজেন-পরমাণুর বৈশিষ্ট্য নিয়ে নানান সফলকাম গবেষণা হয়েছে, পরমাণুতত্ত্বের নানা অনাবিষ্কৃত দিকে দৃষ্টি ঘোরানো সম্ভব হয়েছে। হাইড্রোজেন-পরমাণু ছাড়াও অন্যান্য পরমাণুর গঠন-বৈচিত্র্য এখন জানবার চেষ্টা করা হচ্ছে। যেমন সবচেয়ে ভারী পদার্থ ২৩৫ ওজনের ইউরেনিয়াম—সেখানে বাইরে ইলেকট্রনের সংখ্যা ৯২, ভিতরে প্রোটন ৯২ ও নিউট্রন ১৪৩=(২৩৫—৯২)। এ ছাড়া সোনার বেলায় ৭৯টি ইলেকট্রন বাইরে আছে; হিলিয়ামের বেলায় মাত্র দুটি ইলেকট্রন। ইলেকট্রন প্রোটনদের সংখ্যা যাই থাকুক না কেন, তাদের মূল ধর্ম সর্বত্র এক রকম। বিজ্ঞানীরা অঙ্কের সাহায্য নিয়ে বলেন, হাইড্রোজেন-পরমাণুর কেন্দ্রে যে প্রোটন আছে তার ব্যাস সমস্ত অ্যাটমের ব্যাসের প্রায় লক্ষ ভাগের এক ভাগ মাত্র। ইলেকট্রনরা থাকে একেবারে বাইরের দিকে—ইলেকট্রন ও প্রোটনের মাঝখানে পড়ে আছে বিরাট খালি জায়গা। প্রত্যেক অ্যাটমের বেলায়ই এই খালি জায়গা থাকে। ঠিক একটা অদৃশ্য সৌরজগতের মত, নিউক্লিয়াস আর তার চারিদিকে গ্রহ-উপগ্রহের

মত নানা ইলেকট্রন ঘুরছে (হাইড্রোজেন-অ্যাটমে মাত্র একটা)। অ্যাটমের এমন গঠন-পরিকল্পনা রাদারফোর্ড ও নিলস বোর-এর মাথা থেকে বার হয়—১৯১৩ সাল নাগাদ। নতুন কোপারনিকাসের মত যেন তাঁরা এমন কথা শোনালেন !

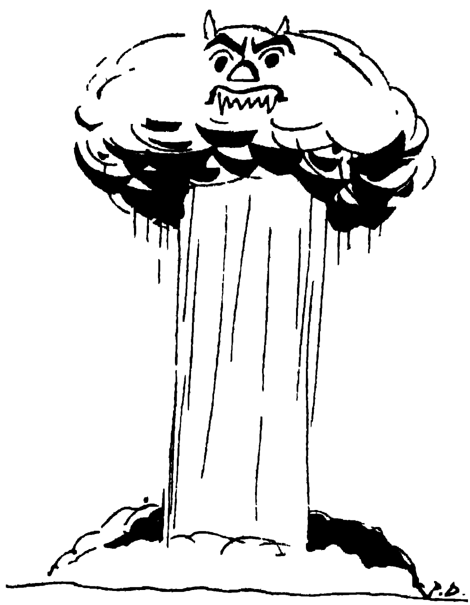
একটা অ্যাটম ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রনের দানাদার হলেও, এ ছাড়া আরও কতকগুলি ক্ষণস্থায়ী কণিকার আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে। এরা অতি অল্পজীবী, মুহূর্তের মধ্যে এদের উদয়, তার পরই এরা বিলীন হয়ে যায়। এদের মধ্যে আছে পজিট্রন, ও নিউট্রিনো-কণিকা ইত্যাদি। দেখা গেছে, পজিট্রন-কণিকার পজিটিভ চার্জ থাকে এবং তা 'নিউক্লিয়ার' সংঘটনে উৎপত্তি হয়। নিউট্রিনোর কোন চার্জ নেই এবং তার ভরও প্রায় নেই বললেই হয়। সাইক্লো-ট্রোন চালাবার সময় এই কণিকা পাওয়া যায়। অ্যান্টি-প্রোটন কণিকার চার্জ হল নেগেটিভ এবং প্রোটনের সমান ভর।

ছোট্ট অ্যাটম ভাঙবার সময়
মস্ত দৈত্যের—উদয়

অ্যাটমের ভিতরমহলে মানুষের বুদ্ধির টহলদারি করার নতুন ধারা সৃষ্টি হল জে জে টমসন (১৮৫৬—১৯৪০) ও আরনেষ্ট রাদারফোর্ড (১৮৭১—১৯৩৭) এর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে। বিশেষ করে এই রাদারফোর্ড ও তাঁর সহকর্মীরা অ্যাটমের অন্দর-মহলের অদৃশ্য দরজা খুলে দেন। ১৯১৭ সালে তিনি প্রথম বুঝতে পারেন, অ্যাটমও ভাঙ্গা যাবে এবং তার দু বছরের ভিতর তিনি সত্যি সত্যি বহুদিনের ঈপ্সিত সাধনায়—এক বস্তুকে অন্য বস্তুতে রূপান্তরিত করায়—সফল হন। তাঁরই গবেষণাগারে ১৯৩২ সালে চ্যাডউইক নিউট্রন কণিকা আবিষ্কার করেন এবং ককরফ্ট ও ওয়ালটন যন্ত্রের সাহায্যে অ্যাটম ভাঙতে সম্পূর্ণ কৃতকার্য হন।

বর্তমানের বহু বিখ্যাত পারমাণবিক বৈজ্ঞানিক রাদারফোর্ড-এর সঙ্গে কাজ করে অ্যাটম-ভাঙ্গার পথ পরিষ্কার করে দেন। যা আর ভাঙা যায় না, সেই মনে করে বলা হয়েছিল—অ্যাটম। জিনিস ভাঙতে ভাঙতে অ্যাটমে এসে থামা গেল না। দেখা গেল অ্যাটমেরও ভিতর, আরও তারপর আছে (cuttables)। অ্যাটমের মধ্যে ইলেকট্রন, প্রোটন আর নিউট্রন রয়েছে। দরকার হলে একটি অ্যাটমের মধ্যে থেকে এদেরও ভেঙেচুরে ছন্নছাড়া করে দেওয়া সম্ভব। ব্যাপারটা অবশ্য শুনতে যত সোজা, কার্যতঃ তত সোজা নয়। লক্ষ লক্ষ অ্যাটম দিয়ে তৈরী মানুষের বুক অল্প আঘাতে ভাঙতে পারে। কিন্তু ছোট্ট অ্যাটমের কঠোর বুক সহজে ভাঙে না! একখানা অ্যাটম কত ছোট, আবার তার ভিতরকার ইলেকট্রন, প্রোটন আর নিউট্রন, তারা আরও ছোট। কিন্তু গাঁথুনিতে তারা বজ্রকঠিন। দেখা গেছে, যে কোন অ্যাটমের বহিরাংশে যে সব ইলেকট্রন-কণিকা আছে তাদের আলাদা করে দেওয়া, এমন খুব একটা মুশকিল নয়, যত মুশকিল অ্যাটমের ভিতরকার নিউক্লিয়াসটি (প্রোটন আর নিউট্রনের সম্মিলিত কেন্দ্রটি) কে ভাঙা। কোন অ্যাটম তাপের কিংবা আলোকরশ্মির সংস্পর্শে এলে সেই পরমাণু থেকে বাইরের ইলেকট্রন-কণিকারা ছুটে বার হয়ে যেতে পারে। কিন্তু অ্যাটমের নিউক্লিয়াস ভাঙা একেবারে অসাধ্য না হলেও দুঃসাধ্য ব্যাপার। বহু দিনের বহু চেষ্টার পর এখন অ্যাটমের কেন্দ্র ভাঙ্গাও সম্ভব। তার ফলেই মারাত্মক পারমাণবিক শক্তির সন্ধান পাওয়া গেছে।

ব্যাপারটা ভারী তাজ্জব। ওই অ্যাটমের নিউক্লিয়াসটি কোন ক্রমে একবার ভাঙতে পারলে দেখা গেছে, আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ ঘষার সঙ্গে সঙ্গে মস্ত দৈত্যের আবির্ভাবের মত বিরাট শক্তি ছাড়া পায়। সে শক্তি যে কী বিরাট এবং তার পরিণাম যে কী



অ্যাটমের কেন্দ্র বা নিউক্লিয়াস ভাঙ্গলে দৈত্যরূপী বিরাট শক্তির আবির্ভাব ঘটে ; হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণে ৭০ থেকে ১০০ কোটি মন বারুদ বিস্ফোরণের সমান শক্তির উদ্ভব হয়। তার শুধু সংহার মূর্তি দেখে ভয় পেলে চলবে না, এর ভিতর গঠনের যে অদ্ভুত ক্ষমতা আছে, তাকে কাজে লাগান মানুষের সম্ভব

ভয়াবহ হতে পারে, তা বলে বোঝানো মুশকিল। ১৯৪৫ সালে *হিরোসিমা-নাগাসাকির বীভৎসতার* মত বা তার চেয়েও আরও সাংঘাতিক কিছু ঘটাতে পারে। সামান্য অ্যাটম চোখে দেখা যায় না, তার নিউক্লিয়াস থেকে এত শক্তি! এত শক্তি নিশ্চয়ই অ্যাটমের ভিতর ঝুড়িচাপা ছিল না। আসল কথা, অ্যাটমের নিউক্লিয়াস ভাঙার সময়, প্রোটন ও নিউট্রন বিচ্ছিন্ন হওয়ার মুহূর্তে অ্যাটমেরই খানিক অংশ বা বস্তু শক্তিতে পর্যবসিত হয়েছে। অর্থাৎ অ্যাটমের মালমসলাই শক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে। এতদিন পর্যন্ত ধারণা ছিল, শক্তি আর বস্তু দুটি সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। কারও সঙ্গে কারও সম্বন্ধ নেই। ১৯০৫ সালে আইনস্টাইন অসম্ভবকে সম্ভব করলেন—পৃথিবী, দেশ, কাল, পাত্র বিচার করবার ধারাটাই পালটে দিলেন। যে সব জিনিস আমাদের কাছে অতি-দূরে মনে হয়, যাদের স্বরূপ আপাতদৃষ্টিতে প্রচ্ছন্ন মনে হয়েছে, তাদের সবার ভিতর আইনস্টাইন একটা যোগসূত্র আবিষ্কার করলেন। যে এই দুনিয়াকে বিচার করতে বসেছে, সে কি অবস্থায় আছে—একজায়গায় ঠাঁই নিয়ে বসে আছে না শূন্যে গতিশীল, সেই হিসেবে বিশ্বের বিভিন্ন রূপ তার দৃষ্টিভঙ্গির উপর প্রতিফলিত হবে, তিনি এই কথাই বোঝালেন। এর থেকে দেশকালের আপেক্ষিকতার মর্ম সবাই বুঝল। তাছাড়া তিনি আরও বোঝালেন যে, যাকে বস্তু বলছি আসলে তা শক্তিরই আর এক রূপ। শক্তিতে বস্তুতে কোন প্রভেদ নেই। বস্তুকে ভেঙে শক্তি করা যায়, শক্তির ঘনীভূত রূপই বস্তু। বিশ্বলোকের তাবৎ পদার্থ একমেবাদ্বিতীয়মেরই বিচিত্র রূপ— equivalence of mass and energy। বস্তু-শক্তির সম্বন্ধপরতা আরও পরিষ্কার হয়ে উঠল 'পরিমাণবাদ' তত্ত্বের উৎকর্ষের সঙ্গে—বস্তুকে আমরা শুধু শক্তির তরঙ্গগুচ্ছরূপে আর নয়, কণিকা-রূপেও পেতে পারি, এ তত্ত্ব জানার গুরুত্ব কম

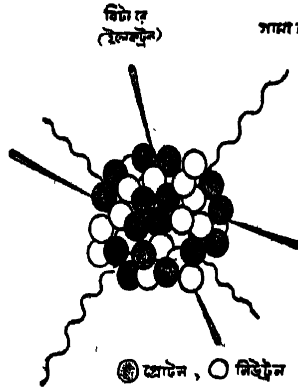


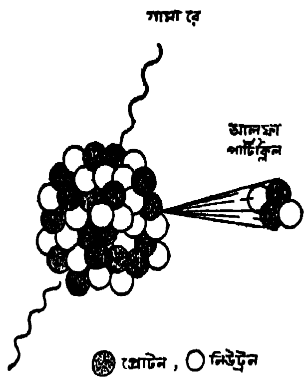
আইনস্টাইন দেখালেন—যা বস্তু তা আর কিছু নয়, শক্তিরই আর এক বিচিত্র রূপায়ণ; এক থেকে অন্যে রূপান্তর তাই সম্ভব

নয়। ম্যাক্সপ্ল্যাঙ্ক, দ্য-ব্রগলি, শ্রোডিনজার, হাইসেনবার্গ প্রভৃতির কৃতিত্ব এইখানেই।

যার নাম বস্তু
তার নাম শক্তি

এখন অ্যাটম ভাঙার যে উপায় বার হয়েছে তাতে বাইরে থেকে ছর্‌রা ছোঁড়ার মত নিউট্রন-কণিকা দিয়ে অ্যাটমকে আঘাত করা হয়। এ পদ্ধতি প্রথম প্রচলন করেন জোলিও কুরী ১৯৩৮ সালে। বাইরে থেকে নিউট্রন-কণিকা অ্যাটমের অন্দর-মহলে এসে ঠোকাঠুকি লাগিয়ে দেয়। একবার ধাক্কাধাক্কির কাজ সুরু হলে তা আপনা-আপনি চলতে থাকে, যতক্ষণ না অ্যাটমগুলি ভাঙার পর একটা হেস্তনেস্ত হচ্ছে। উপযুক্ত শক্তি ও সংখ্যার নিউট্রন-কণিকা বাইরে থেকে পাঠানো শুধু যথেষ্ট কষ্টসাধ্য নয়, অর্থসাধ্যও বটে। কিন্তু মজা এই যে, একটি নিউট্রন-কণিকাও যদি বাইরে থেকে ভিতরে চলে আসতে পারে, তবে সেই হয়ে যায় ভাঙনের দূত। এ রকম করে অ্যাটম-ভাঙার পদ্ধতি গবেষণাগারে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু প্রকৃতিতেই এমন কতকগুলি পদার্থ আছে যা আপনা-আপনি প্রতিনিয়ত ভেঙে যাচ্ছে। কালের কোলে বিচ্ছুরণের ছটা ছড়িয়ে এই সব পদার্থ, এক থেকে আর এক পদার্থে রূপান্তরিত হচ্ছে। একেই বলা হয় তেজস্ক্রিয়া। এ দুনিয়ার সবচেয়ে ভারী পদার্থ ইউরেনিয়াম, আপনা-আপনি কেবল তার ক্ষয় হচ্ছে। এই সব প্রকৃতিতে পাওয়া তেজস্ক্রিয় পদার্থ আবিষ্কারের কাহিনীর সঙ্গে বেকারেল, পিয়ের ও মারী কুরীর নাম জড়িত। ১৮৯৫ সাল থেকে এঁরা বস্তুর তেজস্ক্রিয়া সম্বন্ধে গবেষণা সুরু করেন। কুরী দম্পতি পোলোনিয়াম ও রেডিয়াম আবিষ্কার করে সবাইকে বিস্মিত





প্রকৃতিতে কিছু পদার্থ আছে যা তেজস্ক্রিয়ার ফলে আপনা আপনি ক্ষয় হয়; তেজস্ক্রিয়ার রকম ফের আছে: আলফা-রে—এতে থাকে পজিটিভ চার্জযুক্ত প্রোটন এবং নিউট্রন; বিটা-রে—এতে থাকে নেগেটিভ চার্জযুক্ত ইলেকট্রন; গামা-রে—এ হল বিদ্যুৎ-নিরপেক্ষ, অত্যন্ত ছোট তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য-সম্পন্ন রশ্মি

করে দেন। তেজস্ক্রিয়ার ব্যাপারটা হল এই রকম : যদি কোন অ্যাটমের কেন্দ্রে প্রোটন ও নিউট্রনের সংখ্যার অতিরিক্ত তারতম্য থাকে অর্থাৎ যদি প্রোটনের সংখ্যার চেয়ে নিউট্রনের সংখ্যা অনেক বেশী থাকে, তা হলে সে অ্যাটম স্থায়ী অ্যাটম হতে পারে না। নানাভাবে ক্রমাগত ইলেকট্রন প্রোটন আর পজিট্রন ছড়াতে ছড়াতে তেজস্ক্রিয় অ্যাটমটি আরও হালকা (বা সমান ওজনের দুটি একটি) স্থায়ী অ্যাটমে পরিণত হয়। যখন অ্যাটমের ওজন সমানই থাকে, তখন দেখা গেছে, একটি নিউট্রন পরিবর্তিত হয়ে যায় একটি ইলেকট্রন, একটি প্রোটন এবং একটি নিউট্রিনো কণিকাতে। কোন তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে এই ইলেকট্রন, প্রোটন ও পজিট্রন বেরিয়ে আসাটাকেই মোটামুটিভাবে তেজস্ক্রিয়া বলা যায়। ইউরেনিয়ামের বেলায় এই তেজস্ক্রিয়ার ফলে ইউরেনিয়াম পদার্থটি পর পর রূপান্তরিত হতে থাকে। ইউরেনিয়াম থেকে রেডিয়াম এবং সবশেষে গিয়ে সীসা হয়। সীসার অ্যাটমে নিউট্রন ও প্রোটনের মধ্যে সংখ্যার বিশেষ তারতম্য থাকে না, তাই সীসার অ্যাটম স্থায়ী পর্যায়ে এসে দাঁড়ায়। খুব ভারী পদার্থগুলির (যেমন ইউরেনিয়াম) বেলায় নিউট্রন-সংখ্যাধিক্যের জন্য আর একটি সম্ভাবনা হল : প্রায় সমান দুভাগে ভেঙে গিয়ে দুটি স্বতন্ত্র পদার্থে রূপান্তরিত হওয়া। একে বলা হয় 'ফিসান'। এই ক্রিয়া স্বাভাবিক ভাবেও ঘটতে পারে অথবা বাইরে থেকে কেন্দ্রে নিউট্রন দিয়ে আঘাত করেও ঘটানো যেতে পারে। কৃত্রিম উপায়ে নানা পদার্থের অ্যাটমের মধ্যে বাইরে থেকে পরিমিত সংখ্যায় নিউট্রন-কণিকা পাঠিয়ে নানা রকম 'আইসোটোপ' করা সম্ভব হয়েছে, যার ব্যবহার নানাভাবে মানুষের কাজে লেগেছে। এখানে একটি কথা স্পষ্টভাবে জানা দরকার যে, পারমাণবিক ওজন বিভিন্ন হলেও তাতে পদার্থের

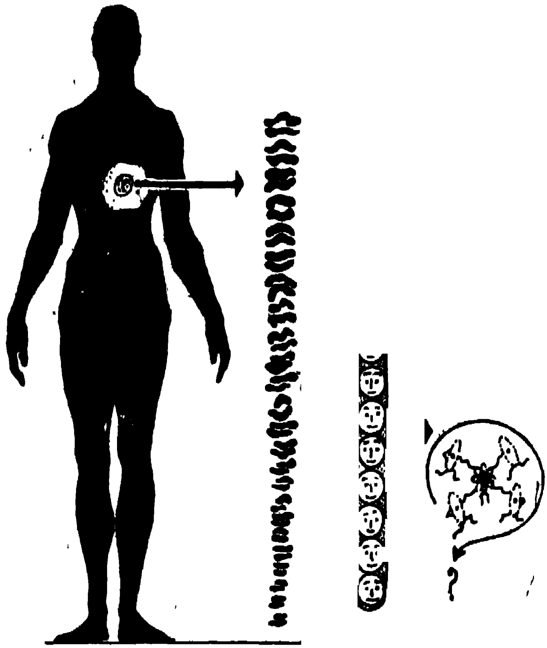
মৌলকত্বের তফাত হয় না। মৌলিক পদার্থের মৌলিকত্ব নির্ভর করে —পরমাণুর কেন্দ্রে অবস্থিত পজিটিভ বিদ্যুৎ-কণিকার উপর অর্থাৎ সমান সংখ্যার ইলেকট্রনের উপর। যে কোন রাসায়নিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়ায় এগিয়ে আসে এই ইলেকট্রনরা। যেমন দৃষ্টান্ত দেখানো যেতে পারে যে, প্রকৃতিতে সাধারণভাবে পাওয়া সীসের পারমাণবিক ওজন ২০৭; কিন্তু তেজস্ক্রিয় পদার্থ ভেঙে যে সীসে তৈরী হয়, তার পারমাণবিক ওজন ২১০, ২১১, ২১২, এমন কি ২১৪ও হতে পারে। কিন্তু এরা সবাই যে-সীসে সেই-সীসে। এর কারণ হল পরমাণুর কেন্দ্রে নিউট্রন পাঠানোর দরুন তার ওজন বাড়ল, কিন্তু ইলেকট্রন প্রোটনের সংখ্যা সমান থাকার দরুন পদার্থের গুণের কোন তারতম্য ঘটল না। এমনি পদার্থগুলিকে বলা হয় আইসোটোপ। কোন কোন বস্তুর ভিতর এই তেজস্ক্রিয়া বহু বছর ধরে সংঘটিত হতে পারে। এই যেমন প্লুটোনিয়াম-এর ভিতর ২৪,০০০ বছর পর্যন্ত তেজস্ক্রিয়ার ক্ষমতা বিদ্যমান থাকে। যে সময়ের মধ্যে একটি পদার্থের পরিমাণ তেজস্ক্রিয়ার ফলে অর্দ্ধেক হয়ে যায়, সেই সময়কে সেই পদার্থের 'হাফ লাইফ' বলা হয়। ইউরেনিয়ামের ৪৫,০০০০,০০০০ বছর, স্ট্রনসিয়ামের ২৫ ও পোটাসিয়ামের ১২.৪ ঘণ্টা করে 'হাফ লাইফ' জানা আছে।

আমরা নিজেরাও
জীবন্ত অ্যাটমের সমষ্টি

বাইরের আকারটা যখন এ বিশ্বজগতের কোন কিছুর বেলায়ই শেষ কথা নয়, তখন মনুষ্যদেহধারী জীবের বেলায় তার অন্যথা কেন হতে যাবে! দেখতে মানুষ যত ছোট কিংবা যত বড়ই হোক না কেন, আসলে তার ভিতরে ভিতরে রয়েছে অদৃশ্য অণু-পরমাণুর জটলা। আয়তনের পরিমাপের উপর কত কোটি পরমাণু থাকবে

তা নির্ভর করে। মানুষের পক্ষে এ কথাই প্রযোজ্য যে, সুশ্রী বিশ্রী চেহারা যাই হোক না কেন, আসলে দেহের নিভৃত নিকেতনে রয়েছে অসংখ্য পরমাণু। কে একজন ধুরন্ধর নাকি কাগজে কলমে হিসেব করে বলেছেন, একটা পূর্ণাঙ্গ মানবদেহে ১০০০০,০০০০০০০০, ০০০০০০০০,০০০০০০০০টি অ্যাটম রয়েছে। সত্যি-মিথ্যের দোহাই না দিয়েও ধারণা করা যেতে পারে যে, বহু কোটি পরমাণু আমাদের শরীরের ভিতরে রয়েছে। শুধু মানুষেরই দেহে কেন, প্রত্যেক গাছপালা, পশুপক্ষী সকলের দেহই নানান অ্যাটম দিয়ে তৈরি। অ্যামিবা থেকে বিরাটকায় হাতী, গণ্ডার পর্যন্ত, সবার দেহ হল বহুরূপী অ্যাটমের বিচিত্র সংকলন।

এ কথা স্বতঃই এখানে এসে পড়ে যে, নির্জীবের মতনই যদি সজীব প্রাণীর দেহ অ্যাটম দিয়ে নির্মিত হয়, তা হলে জড়ে আর জীবে এমন আকাশ-পাতাল প্রভেদ কিসে? সে কথার সঠিক উত্তর মিলতে পারে যদি আমরা আরও খুঁটিয়ে যাচাই করে দেখি যে, কি কি বিশেষ অ্যাটম দিয়ে জীবিত জিনিস সৃষ্টি হয়েছে এবং নিষ্প্রাণ জিনিসের সঙ্গে কোথায়ই বা তার প্রভেদ। জীবন্তের বেলায় প্রথমেই যে অ্যাটমগুলির কথা বলতে হয় সেগুলি হল কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন। এর মধ্যে কার্বন-অ্যাটমের গুণের তুলনা নেই। এই অ্যাটমগুলির বিশেষত্ব হল যে, এরা ভিন্ন রকম অ্যাটমের সঙ্গে নিজেদের সহজে যুক্ত করতে পারে। ফলে অন্যান্য নানান রকমের অ্যাটমের সঙ্গে মিশে এরা সৃষ্টি করেছে পরম আশ্চর্যকর প্রাণপদার্থটি, যাকে বলা হয় প্রোটোপ্লাজম। এতে ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, গন্ধক প্রভৃতি অ্যাটমের সংযোগও আছে দেখা গেছে। একটা কথা এখানে পরিষ্কার করে বলে রাখা প্রয়োজন যে, বিভিন্ন পরমাণুরা যখন প্রোটোপ্লাজম সৃষ্টি করে তখন তারা নিঃসঙ্গ পরমাণু হিসেবে আর না থেকে, নানান পরমাণুর সঙ্গে সঙ্ঘবদ্ধ



আমাদের দেহেও বিভিন্ন অ্যাটমের বিচিত্র সংস্করণ—সারা দেহে লক্ষ লক্ষ সেল আছে—সেলের নিউক্লিয়াস-এর ভিতরে উত্তরাধিকার-সূত্র ক্রমোজোম (মানুষের বেলা ৪৮টা), প্রত্যেকটি ক্রমোজোম-এর গায়ে বহু অদৃশ্য জিনরা চোখ চেয়ে থাকে। তাদের ভিতর জীবন্ত অ্যাটমের যে কেরামতি তা এখনও সব ঠিক বুঝে ওঠা যায় নি, কিন্তু তা বলে তাদের অস্বীকার করা চলে না

হয়ে থাকে অণুর আসরে'। অ্যাটমগুলি আছে ঠিকই, কিন্তু তারা সৃষ্টির তাগিদে আর সৌহার্দ্যের খাতিরে, রয়েছে একত্রিত ভাবে মলিকিউলের আকারে—প্রাণীর দেহে তা জৈব-রসায়ন; প্রোটো-প্লাজম। তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে, এই প্রোটোপ্লাজমের ভিতর প্রায় আশি ভাগই জলীয় পদার্থ। সাত আট ভাগ হল প্রোটীন আর বারো তেরো ভাগ অন্যান্য নানান জিনিসের সংমিশ্রণ। এর মধ্যে যাকে বলা হচ্ছে প্রোটিন, সেইটুকুই প্রাণপদার্থের সবচেয়ে মূল বিষয়বস্তু। এক কথায় এই প্রোটিনের জন্যেই প্রাণ। বিজ্ঞানীরা একে নিউক্লিও-প্রোটিন আখ্যা দিয়েছেন।

মানুষের দেহের মধ্যে প্রাণপদার্থ কেমন ভাবে সংরক্ষিত থাকে, তা জানবার মত। মানুষের সারা দেহ অগণিত কোষ বা সেল দিয়ে তৈরী। এই সেল আবিষ্কার করেন ১৬৬৫ সালে রবার্ট হুকে। তারপর থেকে কত গবেষণা হয়েছে এবং বার বার প্রমাণিত হয়েছে যে ইমারত বানাতে যেমন ইট লাগে, তেমনই দেহগাঁথুনির কাজে জীবকোষের সারির দরকার। থাকে থাকে সাজিয়ে গুজিয়ে বিছিয়ে রয়েছে জীবকোষ, প্রত্যেক প্রাণী, প্রত্যেক উদ্ভিদের ভিতর। তাদের নানান বিন্যাস সৃষ্টি করেছে দেহের ভিতরকার সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। দেহের প্রত্যেকটি অঙ্গ তৈরি হয়েছে নানারকম সেল দিয়ে। আর প্রত্যেকটি জীবকোষের ভিতরে থাকে সদাচঞ্চল প্রাণপদার্থ। কোষেরা জীবিত, তাদের ভিতরে অ্যাটম দিয়ে সংগঠিত জীবনের সত্তা—সেই প্রোটোপ্লাজম বিরাজমান দেহের সর্বত্র; মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত, সবকিছু প্রোটোপ্লাজম দিয়ে পুষ্ট।

কোন নিষ্প্রাণ পদার্থে অণু-পরমাণুরা প্রোটোপ্লাজমের বৈশিষ্ট্য রেখে যায় নি। প্রোটোপ্লাজম একমাত্র শুধু জীবন্ত কোষের মধ্যেই দেখতে পাওয়া যায়, অন্যত্র কোথায়ও নয়। গোলকুণ্ডার হীরের

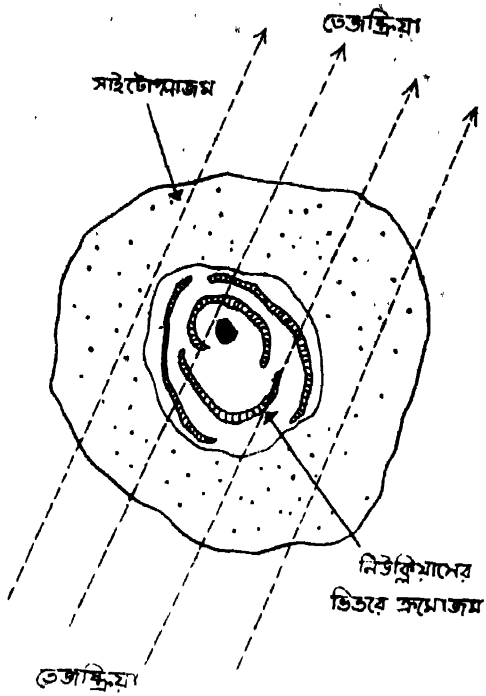
খনিতে প্রোটোপ্লাজমের এক ছিটেও মিলবে না। যদিও প্রোটোপ্লাজমের নানান পরমাণুর মধ্যে যেটি খুব বড় পৃষ্ঠপোষক, সেই কার্বন-অ্যাটম, সেখানে দেদার দেখা যেতে পারে। বুকের মধ্যে অগ্নিকণার সম্ভাবনা নিয়ে কার্বন সেখানে অঙ্গারের মত পড়ে আছে। আর শুধু কার্বন-পরমাণু তো প্রোটোপ্লাজমের একমাত্র উপাদান নয়। প্রোটোপ্লাজমের বৈশিষ্ট্য কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেনকে একসঙ্গে বেঁধে এমন অদ্ভুত একটা জৈব-পরিস্থিতির সৃষ্টি, যা আর কোথাও কোনখানে দেখতে পাওয়া যায় না। আমরা নিত্যনৈমিত্তিক সব কাজ করে যাচ্ছি, খাচ্ছি, চলছি, ফিরছি—এই প্রাণোচ্ছলতার পিছনে প্রোটোপ্লাজমই রয়েছে। ভাবনার শিখরে, মাথার ভিতর স্নায়ুমণ্ডলীর মধ্যেও ব্রেন-সেল, আর তাদের মধ্যেও অগুণতি পরমাণু।

প্রাণ-পাওয়া
অ্যাটমের কেরামতি

যে পদার্থ জৈব, তার প্রধান ও প্রথম গুণ হল, সে তার মতন আর একটি জিনিস তৈরি করতে পারে অনায়াসে—অটোক্যাটালিটিক। দেখা যায়, সেলের ভিতর যে প্রোটোপ্লাজম থাকে তার ভিতরে আর একটি বিশেষ জিনিস আছে, সেটিকে বৈজ্ঞানিকরা বলেন—প্রাণকেন্দ্র বা নিউক্লিয়াস। সেইটিই জীবনসংরক্ষণের মূল কেন্দ্র। জীবকোষের মণিকোঠার ভিতর আরও কিছু নিগূঢ় পদার্থের সন্ধান বিজ্ঞানীরা পেয়েছেন। প্রত্যেকটি কোষের প্রত্যেকটি নিউক্লিয়াসের ভিতর থাকে কতকগুলি সুতোর মত সূক্ষ্ম জিনিস, এগুলিকে বলে ক্রোমোজম। এদের সংখ্যা বিভিন্ন প্রাণী ও উদ্ভিদ দেহে বিভিন্ন। যেমন, মানুষের বেলায় নিউক্লিয়াসের মধ্যে আটচল্লিশটা ক্রোমোজম থাকে—এক রকম চিংড়ির বেলায় একশো আটানব্বইটা, কুকুরের বেলায় আটাত্তরটা।

এ ছাড়া এক রকম মশাতে ছটা এবং মুরগীর বেলায় আঠারটা। সবচেয়ে কম সংখ্যা দেখতে পাওয়া যায় ক্রিমি-জাতীয় এক রকম জীবে—তাদের বলা হয় এস্ক্যারিস ; সেখানে প্রত্যেক নিউক্লিয়াসে মাত্র চারটি করে ক্রোমোজম থাকে। এগুলিই উত্তরাধিকারের সূত্র। এই সুতোগুলির গায়েই প্রাণীর সত্তার যাবতীয় দোষগুণ অন্তর্নিহিত। সুতোগুলি অণুবীক্ষণের সাহায্যে বড় করে দেখা যায়। কিন্তু এইসব ক্রোমোজমের গায়ে যে সব দোষগুণের সারি-কেন্দ্র আছে, তাদের মাইক্রোসকোপে, এমন কি ইলেকট্রন-মাইক্রোসকোপের নীচেও, দেখা আজও সম্ভব হয় নি। তাদের নাম দেওয়া হয়েছে 'জিন'। টমাস হুণ্ট মরগান (১৮৬৬-১৯৪৫) জিন সম্পর্কে গবেষণার সূত্রপাত করেন। ভাঁড়ার ঘরের ড্রোসোফিলা নামক মাছির উপর বহু পরীক্ষা নিরীক্ষা করে, উত্তরাধিকারের পিছনে যে জিন-বৈশিষ্ট্য আছে, সে বিষয়ে তিনি এবং পরে অন্যেরা, আলোকপাত করেছেন। প্রকৃতপক্ষে প্রাণ-প্রবাহের মাঝে উত্তরাধিকারের অয়ন-চলন সম্পর্কে প্রথম গবেষণা করেন অস্ট্রিয়ার একজন পাদ্রি—গ্রেগর মেনডেল (১৮২২-১৮৮৪), ছোট বড় কড়াইসুঁটি গাছের মধ্যে বর্ণ-সঙ্কর তৈরী করার ভিতর দিয়ে। কিন্তু দেখা গেল শুধু কড়াইসুঁটির নয়, সকল জৈব বস্তুরই উত্তরাধিকারের একটা নিয়ম আছে—এবং তা উত্তরাধিকারের সূত্রের ভিতর দিয়ে ক্রমাগত প্রকাশ পায়।

সন্তানের প্রথম কোষটি বাবার এবং মার উত্তরাধিকারের সঙ্গম-স্থল। বাবার অর্ধেক ও মার অর্ধেক বৈশিষ্ট্য পেয়ে সন্তান কেমন করে একটি পূর্ণাঙ্গ অবয়ব প্রাপ্ত হয়, তা আধুনিককালে ভ্রূণ-তত্ত্বের গবেষণার বিষয় হয়ে উঠেছে। তিলে তিলে, কত বিচিত্রভাবে নানান জীবের মধ্যে, তাদের জন্মগত বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে এবং সেই পরিণতির সময় সেলের ভিতর কি রাসায়নিক পরিবর্তন সংঘটিত হয়, সে



কি প্রাণী, কি উদ্ভিদ দেহে, অগুণতি সেলের ভিতর রয়েছে জিন, ক্রমোজম, সাইটোপ্লাজমের মত মূল্যবান জৈব সামগ্রী; তেজস্ক্রিয়ার ব্যবহারের অসাবধানতার ফলে এদের রাসায়নিক সঙ্গতি ব্যাহত হতে পারে, যার জন্তে ভ্রূণের গঠনে, উত্তরাধিকারের চলনে এবং রোজকার জীবনধারণে আসতে পারে বৈলক্ষণ্য—তেজস্ক্রিয়া সম্পর্কে চাই হুঁসিয়ারী

সম্বন্ধে আমরা এখন বেশ কিছু জানতে পারছি। হানস স্পেমান (১৮৬৯-১৯৪৩) এই পথের নতুন সন্ধান দিয়েছেন ব্যাঙের পরিণতির সঙ্গে গঠন বৈচিত্র্যের কার্য-কারণ দেখিয়ে। বর্তমানে রস হ্যারিসন, ওয়াডিংটন, পল ভাইস ও হোল্টফ্রেটার প্রভৃতি, ভ্রূণ-তত্ত্বের মৌলিক গবেষণা নিয়ে ব্যাপৃত আছেন। আমাদের চোখের আড়ালে কিভাবে নানান ভ্রূণের মধ্যে অজস্র অণু-পরমাণুরা সেলের ভিতর থেকে সৌষ্ঠব ফুটিয়ে তোলে, তার শেষ কথাটি এখনও জানতে বাকী। সবে জানা সুরু হয়েছে। বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে প্রভেদের মূল কারণ—প্রত্যেকটি প্রাণীর নিজেদের স্বাতন্ত্র্যের স্বাক্ষর রয়েছে ক্রোমোজমের গায়ে। পিতামাতার ভিতর দিয়ে সন্তান-সন্ততি ক্রোমোজমের মাধ্যমেই উত্তরাধিকারের যাবতীয় দোষগুণ পায়। মানুষের সন্তান মানুষের ক্রোমোজমের ভাগিদার। প্রত্যেক জীব, জন্তু, উদ্ভিদ, নিজের নিজের পিতামাতার ক্রোমোজম এবং ক্রোমোজমের সূত্রে তাদের জিনের সমস্ত বৈশিষ্ট্য পায়। আর যার প্রাণ নেই, তার প্রোটোপ্লাজম নেই, নিউক্লিয়াস নেই, আর নেই ক্রোমোজম। তাই তা সর্বাঙ্গীণভাবে জড়। সেখানে উত্তরাধিকারের প্রশ্ন ওঠে না।

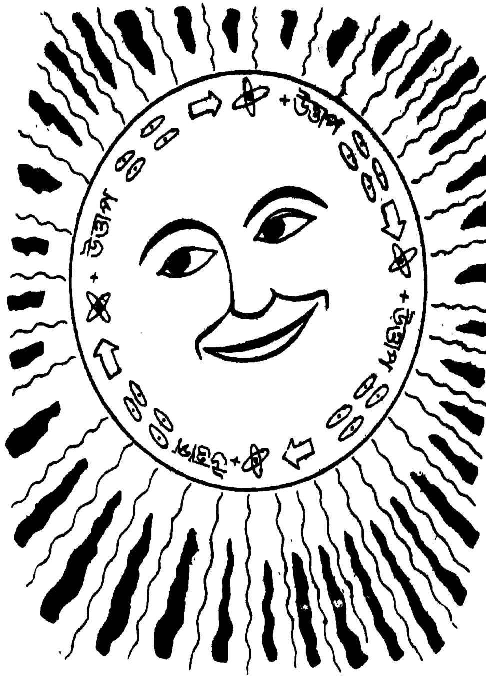
অ্যাটম-অ্যাটম-খেলা
সবচেয়ে সাবেকী খেলা

ব্যাটে-বলে ক্রিকেট খেলা—সে আর কত দিনেরই বা পুরোনো খেলা—বড় জোর একশো দেড়শো বছরের হবে। টেস্ট ম্যাচ হলে চার দিন, নয় তো দিনে দিনেই খেলা শেষ। কিন্তু অ্যাটম-অ্যাটম-খেলা এ দুনিয়ার সবচেয়ে আদি ও অকৃত্রিম খেলা—সুরু হয় পৃথিবী সৃষ্টি হবার আগে। তখন মহা-শূন্যে শুধু পরমাণুর মহাসমুদ্র ছিল। আসলে এই খেলার

ফলেই সৃষ্টি হয়েছে পৃথিবী। আইনস্টাইন বলেছেন যে, কালের ধর্ম বিশ্ববস্তুকে সত্যের দিকে, বিশ্ববস্তুর মিলনের দিকে, এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। বিপুল বিশ্বে পৃথিবীর মত অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহ সবকিছুরই সৃষ্টির রহস্য বিরানব্বই রকম পদার্থের উপাদানের অন্তর্ভুক্ত। সূর্যের দিকে তাকালে কে বুঝতে পারে যে প্রায় চার পাঁচ শো কোটি বছর ধরে ওখানে সর্বক্ষণ চলেছে হাইড্রোজেন থেকে হিলিয়াম হয়ে যাওয়ার অ্যাটম-অ্যাটম-খেলা। এ খেলার তুলনা নেই। দিবারাত্রি সূর্যের অগ্নিময় মুকুটের চাপে অসংখ্য হাইড্রোজেন পরমাণু পিষ্ট এবং ঘনীভূত হচ্ছে। সেখানকার দেড়শো কোটি ডিগ্রী উত্তাপের প্রভাবে হাইড্রোজেন পরমাণু একের সঙ্গে অন্যে মিলিত হয়ে হঠাৎ হিলিয়াম গ্যাস তৈরী করছে। একথা বিবেচ্য যে, চারটি হাইড্রোজেনের ভর একটি হিলিয়াম-এর চেয়ে কিছু বেশী—অতএব, লুপ্ত ভর আলো, উত্তাপ ও নিউট্রিনো রূপে সূর্য থেকে বার হচ্ছে। প্রতি সেকেণ্ডে চল্লিশ লক্ষ টন ওজনের বস্তু শক্তিতে পরিবর্তিত হচ্ছে। কতদিন ধরে কত বিস্তৃত সময় নিয়ে এই খেলা চলে আসছে—এর যেন শেষ নেই। সূর্যের চারদিকে বিস্তৃত গ্যাসের অবরোধী আচ্ছাদন থাকায় এই অবরোধ ভেদ করে সূর্যের বাইরে তাপ আসতে বহুশত বছর কেটে যায়। সূর্য-শক্তি সম্পর্কে যাঁরা তাঁদের অসামান্য অবদান রেখে গেছেন, তাঁদের মধ্যে গ্যামো, ফার্মি ইত্যাদি প্রসিদ্ধ। শূন্য-বিহারী বিচিত্র সব অ্যাটমরা পরস্পরের সঙ্গে মিলে মিশে সৃষ্টি করল এ পৃথিবী, আর তার যাবতীয় নিষ্প্রাণ চিত্র-বিচিত্র আলেখ্যের মেলা—সে প্রায় তিন-চার শো কোটি বছর আগেকার ব্যাপার। কিন্তু সেখানেই অ্যাটমের সঙ্গে অ্যাটমের সংস্পর্শ শেষ হয়ে যায় নি। কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, এই সব অ্যাটমরা অকস্মাৎ একদিন

কোন মহালয়ে এমন কাছাকাছি এসে পড়েছিল, যার ফলে এই সব ঘুমন্ত পরমাণুরা বিশেষ পরিবেশগুণে জীবন্ত হয়ে ওঠে। অ্যাটমদের সে এক অদ্ভুত রূপান্তর! এ ঘটনা আনুমানিক প্রায় আড়াই শো কোটি বছর আগে ঘটে। সেই থেকে জন্ম-মৃত্যুর হাতকে উপেক্ষা করে প্রোটোপ্লাজমের ধর্ম অবিরত অক্ষুণ্ণ রয়েছে নতুন প্রোটোপ্লাজম তৈরি করে দেওয়াতে। এই সৃষ্টির কারখানায় অণু-পরমাণু আর প্রোটোপ্লাজমের তাই কখনও এতটুকুও ছুটি নেই। একের পর এক, জীবনের নানান ক্রম-বিকাশের ভিতর দিয়ে নতুন নতুন অধ্যায় খুলে গেল, অগণিত সব প্রাণীর উদয় হল। সবার তলে তলে চলেছে অদৃশ্য অ্যাটমদের কার্যকারিতা। সেলের ভিতর, নিউক্লিয়াসের মধ্যেকার ক্রোমোজমরা, সেখানকার অণু-পরমাণুর মারফৎ জীবনের সিংহদ্বারে বারে বারে নিয়ে এসেছে বৈচিত্র্য-বাহার। কোন একজন বা দুজন মহাত্মার খেয়াল-খুশী চরিতার্থ করবার জন্যে অ্যাটমে-অ্যাটমে এত মেলামেশা, এত উচ্ছ্বাসের ঘনঘটা নয়—একটা আকস্মিক তাড়না কোথা থেকে অতর্কিতে এসে, বার বার অ্যাটমে-অ্যাটমে লাগিয়ে দেয় জোড়-বেজোড়ের চমকপ্রদ খেলা। এতেই সৃষ্টির সৌকর্য।

কোটি কোটি বছর ধরে চলেছে প্রকৃতির মধ্যে অ্যাটম-অ্যাটম-খেলা। কেউ কোনদিন কখনও তার তদারক করেনি বা তার প্রতি ভ্রূক্ষেপও করেনি। কিন্তু মানুষ তার অসীম দুঃসাহস নিয়ে এখন অনেক রহস্যই বার করে ফেলছে। স্থির জেনেছে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সবচেয়ে ছোট্ট যে জিনিস অ্যাটম, তারই মধ্যে আছে সবচেয়ে মারাত্মক রকমের ক্ষমতা। সে শক্তি পাহাড় টলাবে, গগন ফাটাবে। এ পারমাণবিক শক্তি, আরও ঠিক ভাবে বলতে গেলে, 'কেন্দ্রিক' শক্তি। হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণে যে প্রভূত শক্তি সঞ্চার হয় তা, ৭০ থেকে ১০০ কোটি মন বারুদ এক



অ্যাটম-অ্যাটম-খেলা এ পৃথিবীর সবচেয়ে সাবেকী খেলা—কোটি কোটি বছর ধরে, সূর্যের অগ্নিময় মুকুটে দেড়শো কোটি ডিগ্রী উত্তাপের মাঝে চলছে হাইড্রোজেন থেকে হিলিয়াম হয়ে যাওয়ার খেলা, সেই সঙ্গে হয় আলোর, উত্তাপের আর নিউট্রিনোর নব নব জন্ম। সূর্য থেকে পৃথিবী প্রায় ৯ কোটি মাইল দূরে, কিন্তু সূর্যের আলো প্রতি সেকেণ্ডে ১৮৬,০০০ মাইল বেগে (৮ মিনিটের ভিতর) পৃথিবীতে এসে পড়ে প্রতিক্ষণ বাঁচবার নতুন খবর দেয়। কিন্তু এখন মানুষ পৃথিবীতে থেকেই নিজে অ্যাটম-অ্যাটম-খেলার সংবাদ বিশ্বের সর্বত্র পাঠাতে ব্যস্ত

সঙ্গে বিস্ফোরণের যে শক্তি বার হয়, তার সমতুল্য। অ্যাটমের প্রয়োজনীয় মূল কথাগুলি জেনে ফেলার পথ পরিষ্কার হচ্ছে। এখানে, পৃথিবীতে বসে, দূর দূর গ্রহান্তরে অ্যাটমের কি ভেলকিবাজি চলেছে, তার সঠিক খবরও সব ক্রমে ক্রমে পাওয়া যাচ্ছে। ইলেকট্রনের নতুন নতুন ধর্ম জেনে ভাল্‌ব্‌, রেডিও, টকি, টেলিভিশন, ইলেকট্রন-মাইক্রোসকোপ প্রভৃতির অসাধারণ উন্নতি সম্ভব হয়েছে।

অ্যাটম দিয়ে
হয় স্বর্গের সাধন নয় শরীর পাতন

কিন্তু মানুষের খবরদারির সঙ্গে সঙ্গে জীবনের হাসি-খুশী-ভরা স্বচ্ছ নীল আকাশে একটা ভয়করাল মেঘের ছায়াপাত হয়েছে। কারণ, পরমাণুর অন্তর্নিহিত শক্তিকে বার করার কলাকৌশল জেনে ফেলার যে গুণ তাই পণ্ড হবে, যদি অসদ্ব্যবহারে মারাত্মক কিছু ঘটানো হয়। ইচ্ছামত এখন দরকার-অদরকারে বাদাম-ভাঙার মত অ্যাটম-ভাঙা সুরু হয়েছে। তার ফলে আকাশ ছেয়ে তেজস্ক্রিয়া সর্বত্র হু-হু করে হাওয়ার সঙ্গে ছড়িয়ে পড়বার ভয় রয়েছে। সেই অ্যাটম-ভাঙা তেজস্ক্রিয়া মানুষের নিজের প্রোটোপ্লাজমের অ্যাটমদের পক্ষে মারাত্মক। দেখা গেছে, প্রাণ-পদার্থের মূল বস্তু—ক্রোমোজম, তেজস্ক্রিয়ার ফলে গুরুতরভাবে আঘাত পেতে পারে। ল্যাবরেটোরীর মধ্যে অ্যাটম-বোমা ছুঁড়ে নয়, অন্য ভাবে সূক্ষ্ম ও স্বল্প তেজস্ক্রিয়ার ব্যবহারে, নানান পরীক্ষা করে স্বতঃসিদ্ধ ভাবে জানা গেছে, জীবনের সুতোগাছাগুলি, মানে ক্রোমোজমগুলি, সহজে ভেঙে যেতে পারে। এ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রাণিবিদ্‌ মলার ১৯২৭ সালে, লোকচক্ষুর সামনে এ কথার সত্য উদ্‌ঘাটন করেন যে, এক্স-রের সাহায্যে, ক্রোমোজমে অধিষ্ঠিত জিনদের বিলক্ষণ

পরিবর্তন করা চলে ; জিন-এর প্রায় বেশীভাগ ক্ষেত্রেই এই রকম রূপান্তর বা মিউটেসন, সুষ্ঠু ও সুস্থ উত্তরাধিকারের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর। এতে সন্তান-সন্ততিদের পূর্ণাঙ্গ পরিণতির ব্যাঘাত ঘটে, এমন কি যে কোন অবস্থায় তার ফলে মৃত্যু হওয়াও বিচিত্র নয়। কোষবিভাজনেও বিশেষ তারতম্য দেখা যায়। মূলতঃ তেজষ্ক্রিয়ার আধিক্যে জীবনের স্বচ্ছন্দ সম্পূর্ণ রূপ কখনও প্রকাশ পেতে পারে না। সম্প্রতি প্রেসিডেন্সী কলেজের গবেষণাগারে আমরা মুরগীর ভ্রূণের উপর তেজষ্ক্রিয়ার প্রভাবে যে ফল পেয়েছি তা থেকে বোঝা যায় যে, জীবদের পূর্ণাঙ্গ অবয়ব প্রাপ্তির আগে সেলের উপর এর প্রভাব খুব ক্ষতিকর। তেজষ্ক্রিয়া-প্রাপ্ত ভ্রূণের গঠনে সম্পূর্ণতা থাকে না ; চোক, নাক, মাথা, এইসব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্রকাশও পায় না। অতিরিক্ত তেজষ্ক্রিয়ার প্রভাবে ভ্রূণ কোন কিছুতে রূপান্তরিত হতে অক্ষম—সেখানে সেলরা কোন গঠনাকৃতি না দেখিয়ে সিল্কের চাদরের মত সমান হয়ে পড়ে থাকে ; এতে ভ্রূণের মৃত্যু—জীবনের অবসান। তেজষ্ক্রিয়ার মন্দ ফল যেমন পাওয়া গেছে তেমনই তেজ-ষ্ক্রিয়ার ব্যবহারে কিছু সুফল পাওয়াও সম্ভব। যেমন, ক্যানসারে অত্যধিক কোষ বিভাজন তেজষ্ক্রিয়ার ব্যবহারে কমতে পারে। ব্যবহারে দ্রব্যগুণ ফলায়। এই শেষ নয়, অঙ্কের সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে এখন গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে অ্যাটম-অ্যাটম খেলার সব কথা খোঁজা হচ্ছে ; সে খেলার রীতিনীতি বোঝার চেষ্টা চলেছে।

অর্জুনের হাতে গাণ্ডীব থাকা বোঝা যায়, কিন্তু শিশুর হাতে হাতবোমা ? আজকের ক্ষমতালোভী মানুষের হাতে অ্যাটমের মারাত্মক অস্ত্র নির্ভয়ে ছেড়ে দেবার যো নেই। কি করতে কি হয় ! এর অসদ্ব্যবহারে স্বর্গ-মর্ত্য রসাতলে চলে যাবে, মানুষ নিজের হাতেই নিজের মর্মান্তিক পরিণতি ঘটাবে। এতদিনের এত অ্যাটমের রূপের ডালি সব নিঃশেষ হয়ে যাবে। কিন্তু পারমাণবিক শক্তির সুব্যবহারের

কত যে সুফল হতে পারে, তার সব কথা আমরা সবে জানতে সুরু করেছি। এর আনুকূল্যে পৃথিবীর রুক্ষ চেহারা বদলে সজীব শ্যামলিমায় ভরে দেওয়া যায়। পাহাড় ফাটিয়ে, নদীর স্রোত বেঁকিয়ে, বন্ধ্যা মরুভূমিকে করা যায় উর্বরা, মনুষ্যোপযোগী, মনোরম বসবাসের জায়গা। পৃথিবীতে এর অনেক দৃষ্টান্ত আছে। পারমাণবিক শক্তিকে মানুষের হাজার রকম কাজে লাগানো সম্ভব—তাতে মানুষের সমাজের অশেষ উন্নতি ও কল্যাণকর পরিণতি ঘটবে। কিন্তু সেই সঙ্গে এর অকল্যাণের উগ্র মূর্তিটাও ভয়াবহ। প্রায়ই পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটানো হচ্ছে। ফলে বায়ুমণ্ডল দূষিত হয়ে, যেখানে সেখানে তেজস্ক্রিয়-বৃষ্টি হচ্ছে—আবহাওয়ায় তেজস্ক্রিয়ার ভাগ বেড়ে যাওয়াও অসম্ভব নয়। সামান্য অসাবধানতায় অ্যাটম থেকে নির্গত প্রচণ্ড তেজস্ক্রিয়া এত দিনের অণুর উত্তরায়ণ-প্রসূত প্রাণ আর নিষ্প্রাণের সমগ্র চিহ্ন সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করে দেবে, তা কখনও হতে পারে না। মানুষের শুভবুদ্ধির দাক্ষিণ্যে আস্থা রেখে বলতে হয়—অ্যাটমের ভিতরকার রহস্য, সেখানকার সমস্ত শক্তির প্রভুত্ব, মানুষের হাতের মুঠোর ভিতর চলে আসুক, যাতে মানুষের উন্নত, নির্ভয়, সাধনার পথ সুপ্রশস্ত হবে। কিন্তু তার অপব্যবহারের পরিণাম শোচনীয় হবে—শুধু মানুষ নয়, সারা পৃথিবীটাও সুদূর মহাজাগতিক শূন্যতার মধ্যে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে আবার পরমাণুতে মিলিয়ে যাবে। তা আমরা চাই না। মানুষের হাতে পারমাণবিক শক্তি ব্রহ্মাস্ত্রের সামিল—এ নিয়ে হয় স্বর্গের সাধন নয় শরীর পাতন।

বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের বৈজয়ন্তী

১৮৯০ —— মেনডেলিফ-এর রাসায়নিক পর্যায়সূত্র, রন্টগেন-এর এক্স-রে, বেকারেল-এর তেজস্ক্রিয়া, স্বয়ংগচ্ছযানের প্রসার, বাড়ী তৈরীতে স্টিল-ফ্রেম ব্যবহার, নানান রাসায়নিক জিনিসের সংশ্লেষণ

১৯১০ —— ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক-এর কোয়ানটাম সূত্র, আইনস্টাইন-এর আপেক্ষিকতা, কুরীদের রেডিয়াম, রাদারফোর্ড—সোডি-র তেজস্ক্রিয় রূপান্তর, রাদারফোর্ড-নিলস বোর-এর অ্যাটমের পরিকল্পনা, জৈব-রসায়নের প্রবর্তন, প্যাভলভ-এর কন্‌ডিসন রিফ্লেক্স, ডেভরিস-এর মিউটেসন, ভাইরাস-এর গবেষণা, রু ও অন্যান্যদের ফলিত ভ্রূণ-তত্ত্বের নতুন গবেষণা, উইলস্টেটার-এর সালোকসংশ্লেষ, ল্যাণ্ডস্টাইনার-এর ব্লাড-গ্রুপ, হপকিনস-এর ভাইটামিন, ভারবুর্গ-এর রেসপিরেটোরী এনজাইম, ব্রেগ-এর কেলাসের গঠন, ডিম্বাণু-শুক্রাণু ও সেল বিভাজন সম্বন্ধে বিস্তর গবেষণা, মরগেন-এর ক্রমোজোম-জিনস ; ট্রাক-লরী, প্লাসকিট-এর সুরু, প্রথম উড়োযান, সস্তাহারে শিল্পজাত জিনিস তৈরী

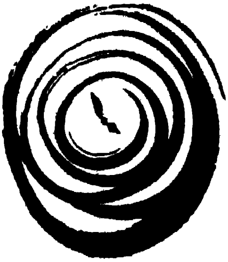
১৯২০ —— দ্য ব্রগলি, হাইসেনবার্গ, শ্রোডিনজার-এর নতুন কোয়ানটাম মতবাদ, ডিরাক-এর তরঙ্গবলবিদ্যা, ককরফট-ওয়ালটন-এর কৃত্রিম উপায়ে অ্যাটম ভাঙ্গা, হর্মোন, আলট্রা সেনট্রিফিউজ, ব্যানটিন-এর ইন-সুলিন, হ্যারিসন-এর টিস্যু কালচার—ভ্রূণের ভিতর স্পেমান-এর অরগানাইজার, মুলার-এর এক্স-রে সাহায্যে মিউটেসন

১৯৩০ —— দিরাক-এর ইলেকট্রন মতবাদ, উকাওয়া-র মেসন, চ্যাডউইক-এর নিউট্রন, জোলিও-র কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়া, অটো হান-এর নিউক্লিয়ার ফিসান, পরিবর্দ্ধনশীল বিশ্ব, জুলিয়ান হাক্সলী-হ্যালডেন-ফিসার প্রভৃতির সমর্থনে, ডারউইন-এর অভিব্যক্তি মতবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত, ভাইরাস এনজাইম কেলাসিত, এঙ্গেলহার্ট-এর মাংসপেশী এনজাইম-এর অনুরূপ, ভাইটামিন-সি ডি, দেহের ভিতরকার রাসায়নিক চক্র, ট্রাকটর, কৃষিকাজ অধিকতর যন্ত্রতন্ত্র, কৃত্রিম রবার

১৯৪০ —— প্রথম ফিসান পাইল, অ্যাটম বোমা, দিরাক-এর কোয়ানটাম মতবাদ, পিরুটস-এর প্রোটিনের এক্স-রে, রাডার, কসমিক রে, ডিসইনট্রেগ্রেসন, ইলেকট্রন মাইক্রোসকোপ, জেট প্লেন, টেলিভিসন, রেডিও-জ্যোতিষ, স্বয়ংক্রিয় কারখানা, অধিকতর শক্তি করায়ত্ত, ইয়ং-এর স্নায়ু তন্ত্রে আলোকপাত, ভাইরাস -ব্যাকটিরিয়া নিয়ে অনুসন্ধান, এনটিবডি-পেনিসিলিন

১৯৫০ —— আইনষ্টাইন-এর আপেক্ষবাদ, তাপাণবিক সংঘটন, হাইড্রোজেন বোমা, প্রভূত পারমাণবিক শক্তির সঞ্চয়, নানা কাজে আইসোটোপ-এর ব্যবহার, অ্যামিনো অ্যাসিড নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা, নানান রাসায়নিক ওষুধ, কর্টিজোন

২০০০ (?) —— জীবন ও জগত সম্বন্ধে আরও ওয়াকিবহাল, দুনিয়াকে ভাল ভাবে জানা, প্রকৃতির শক্তির উপর হুকুমদারি, নতুন নতুন রাসায়নিক হাতিয়ার, গ্রহান্তরে যাত্রা, মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই, বিশ্ববোধ জাগ্রত, শক্তির স্বার্থে পারমাণবিক শক্তির ব্যবহার আর নয়, মানুষ ও পৃথিবী রসাতলে



শেষ কথাটির শেষ নেই

চতুর্দিকে

বিজ্ঞানের কেরামতি

সকালে ঘুম ভাঙার পর থেকে রাত্রে আবার চোখ বোঁজা পর্যন্ত, প্রতিদিন এই সময়টুকুর মধ্যে কাজ কি একটা? হরেকরকম। চব্বিশটা ঘণ্টা জোড়া দিয়ে একটা দিন। এক, দুই, তিন করে গুণে তিরিশ দিনে মাসটা কাবার, এমনি বারটা মাসে একটা বছর। এমন ধারা কত বছর এলো, আর কত বছর গেল। বছরের টানা-পোড়েনের মধ্যেই দুনিয়াদারি। দুনিয়াটা গোল হতে পারে, কিন্তু দুনিয়াদারিটা মোটেই তা নয়—সেটা রীতিমত তেরচা। সময়ের সঙ্গে বেঁচে থাকবার পদ্ধতি, তিষ্ঠবার উপায় এবং বসবাসের শেকড় গাঁথবার কৌশল, কত যে বদলে যায়! আজকের এই মুহূর্তে যেভাবে দিন গুজরান করছি—অতীতে সেভাবে সম্ভব হয়নি এবং ভবিষ্যতেও যে কিভাবে হবে, তারও কোন হদিস নেই। নিত্যপরিবর্তনশীল জগতে কোন কিছুই হাত-পা গুটিয়ে স্থাণু হয়ে বসে নেই। বিশেষ করে মানুষের সমাজে এখন এই পরিবর্তনের উৎসমূল হয়ে দাঁড়িয়েছে বিজ্ঞান। তারই দাক্ষিণ্যে দিনে দিনে অবারিত হয়ে যাচ্ছে অভূতপূর্ব সব সম্ভাবনার বাতায়ন। এখন পরিবর্তন বয়ে আনবার



আগে ঠাকুরদার আমলে এই কলকাতায় চলত ঘোড়ায়-টানা ট্রাম



কিন্তু এখন? সেখানে বাস-ট্রাম আরও কত রকম স্বয়ংগচ্ছযান। অথচ কত দিনই বা এই সময়ের ব্যবধান—এরই মধ্যে কত পরিবর্তন এল বিজ্ঞানের সাহায্যে

ভগীরথ যেন বিজ্ঞান। ভাটপাড়া, ভবানীপুর, ভিয়েনা তাতে ভেসে যায়। অবশ্য তা কম বেশী। মানুষের সঙ্গে বিজ্ঞানের সম্পর্ক আপাদ-মস্তক, ভিতরে-বাইরে, আলোয়-অন্ধকারে।

আগে শুনেছি ঠাকুরদার আমলে, এই কলকাতায় ঘোড়ায় টানা ট্রামগাড়ীর দারুণ কদর ছিল। এখন সে কথা ভাবলেও মজা লাগে—গল্পকথার সামিল। রকেটের যুগে, দুর্দাম গতিবেগের মাঝে এ যেন নির্মম পরিহাস। কিন্তু কতটুকুইবা সময়ের এই ব্যবধান—এরই মধ্যে কি বিরাট পরিবর্তন! শুধু কি এই একটি বিষয়ে, তামাম দুনিয়াটার চেহারা বদলে যাচ্ছে, যার ফলে দুনিয়াদারিটার রূপও দিন দিন নতুন হয়ে উঠছে। অনেক অনেক বছর আগে, যখন মানুষ গিরি-গহ্বরে বসবাস করত, তখন তার চাওয়া-পাওয়ার সীমানা ছিল নিতান্ত ক্ষুদ্র—বেঁচে থাকবার গণ্ডীর মধ্যেই সব কিছু নিঃশেষিত হয়ে যেত। ভাল কথা, বড় কথা, সুন্দর কথা, এসব ভাববার অবকাশ ছিল না—প্রাণ রাখতে তখন প্রাণান্ত!

সেই রকম যদি আধা-আলো আধা-অন্ধকারের কোন আদিমানুষকে ডেকে জিজ্ঞাসা করা যেত—দুনিয়াটা চলছে কেমন?

যদিও ভদ্রলোকের কথা বলবার কোন জো ছিল না কিন্তু তাতে যে খুব কিছু এসে যেত, তা নয়। কারণ, বলবার বিশেষ কিছু তার নেই। কোন রকমে খাচ্ছিদাচ্ছি, পাথরের তলায় ভয়-ভাবনায় বেঁচে আছি। এইটুকুই যথেষ্ট। তার চেয়ে বেশী কিছু খবর দেবারও নেই—নেবারও নেই।

কিন্তু আজ? যদি কাউকে জিজ্ঞাসা করা যায়—কেমন, সব খবর? তার উত্তর কি একটা? লক্ষটা অনুযোগ অভিযোগ তো আছেই, আবার সঙ্গে সঙ্গে আছে নানান বায়নাক্কা। কোন ফ্রণ্টের কত খবর চাই? হোম-ফ্রণ্ট, অফিস ফ্রণ্ট, বাজেট-ফ্রণ্ট, ট্রান্সপোর্ট-ফ্রণ্ট, সিনেমা-ফ্রণ্ট, আরও কত কি ফ্রণ্ট। কিন্তু দেখা যাবে সব ফ্রণ্ট



তখন প্রাণ রাখতে প্রাণান্ত, বেশী কিছু খবর দেবার বা নেবার ছিল না·
কোন রকমে বেঁচে থাকা

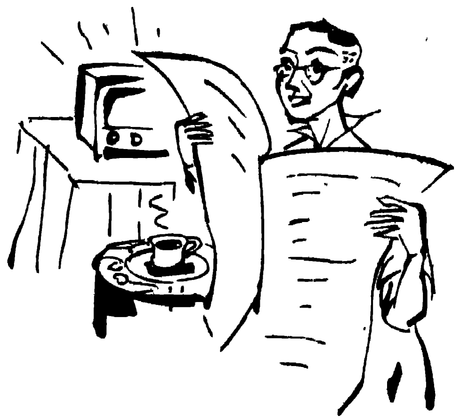


আর এখন! হেসে খেলে জীবনটাকে উপভোগ করে বেঁচে থাকা। এখন
কত ফ্রন্টের কত খবর চাই? সব খবরই কিন্তু কমবেশী বিজ্ঞান-সন্দেশ

থেকে আনা খবরই কম-বেশী ভাবে বিজ্ঞান-সন্দেশ। কেননা এখন আমরা বুঝে না-বুঝে, জেনে না-জেনে বিজ্ঞান-নির্ভরশীল। গায়ের জোরে হয়তো বলা চলে—বিজ্ঞান টিজ্ঞান জনকয়েকের সব ল্যাবরেটারীর মধ্যেকার খেয়াল-খুসীর বিলাস। কিন্তু বাস্তবে মোটেই তা নয়। সমাজে হেন লোক নেই, যিনি অন্তত: কিছু পরিমাণে না বিজ্ঞানী। তার জন্যে বিজ্ঞানের পাশ দিতে হয় না। বিজ্ঞানসম্মত সমাজে বসবাস করতে হলে, রোজকার আচার-ব্যবহারে যে বৈজ্ঞানিক মনোভাবের প্রকাশ পায় সেইটুকুই যথেষ্ট। কেউ আমরা বিজ্ঞান-সংস্পর্শ-বিমুক্ত নই—তাই আমরা একদিক দিয়ে দেখলে সবাই আধা-বিজ্ঞানী।

জুতো সেলাই থেকে
চণ্ডীপাঠ

সাত সকালে এলার্মের চীৎকারে প্রথম ঘুম ভাঙ্গে। ঘড়ির দিকে চাইবার আগে বালিশের পাশ থেকে চশমা নাকের ডগায় বসাতে হয়—তা না হলে দেখার কি সাধ্য! চোখের ভিতরে জন্মে পাওয়া যে লেনস আছে, তারা রেটিনার উপর ছায়া ঠিক ঠিক ফেলাতে পারে না, তাই বাইরে থেকে কাঁচের লেনস দিয়ে সেটাকে শুধরে নিতে হয়। অগত্যা বিছানা ছেড়ে ওঠা। কোথায় ছিল বর্মার বনে সেগুন কাঠ—তাদের তক্তা করে, চিরে, তৈরি করা হয়েছে আমার মনোমত এই সব আসবাব। কোথায় ছিল তুলো, তাদের পিঁজে এই বালিশ, এই বিছানা, এই চাদর। কি ছিল, আর মানুষের হাতে পড়ে কি হল। এখন আর দাঁতন নয়, তার বদলে দাঁতনের গুণ-সম্মত মাজন। ধার চকচকে টাটকা ব্লেড—খোলা ক্ষুর নয়, সেফটি রেজার দিয়ে দাড়ি কামান। গাছের নারকেল নয়—শিশিভর্তি সুগন্ধি তৈল। তারপর



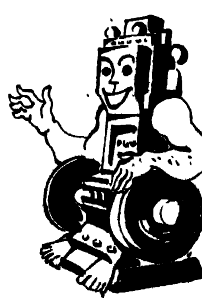
সকালে চায়ের সঙ্গে আনকোরা খবরের কাগজ হাতে নিলে কামাখ্যা, কামাসকাটকা, কালিফোর্ণিয়া আর কলকাতা তখন কোলের মধ্যে। ওদিকে বেতারে ভেসে আসচে এত কথা

শাওয়ারের তলায়, গঙ্গা না গিয়ে গঙ্গাকরা। গঙ্গার জল টালা ঘুরে টালিগঞ্জ আসা, চারটিখানি কথা নয়—রীতিমত বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনার ফল। তারপর দার্জিলিং-এর মনোরম চায়ের কাপে চুমুক—তখন একেবারে সব জল। কোথায় পাহাড়ের পাদদেশে গজান চা গাছ, তার পাতা তুলে, সেঁকে, প্যাক করে দেশ-বিদেশে পাঠান। প্রাতঃকালীন চায়ের নির্ভেজাল সঙ্গী হল পাট-না-ভাঙ্গা, আনকোরা টাটকা খবরের কাগজ। টেলিপ্রিণ্টার আর রোটারী; ধন্যি যন্ত্র—তাদের সাহায্যে ত্বনিয়ার খবর রাতারাতি ছাপা হয়ে সাতসকালেই টেবিলে টেবিলে হাজির। ত্ব হাতে ফাঁক করে কাগজ দেখা নয় তো, এ যেন ত্বটো মুঠোয় পৃথিবীর এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তকে ধরা। তখন কামাখ্যা, কামাসকাটকা, ক্যালিফোর্ণিয়া আর কলকাতা আমার কোলের মধ্যে।

ওদিকে রেডিও থেকে ঈথারে ভেসে আসছে কথামালা—গান, বাজনা, ঘোষণা। আজ ঠাণ্ডা থাকবে না গরম পড়বে, খটখটে রদ্দুর না ঝমঝম বৃষ্টি। শুধু তাই নয়, রোগ হচ্ছে চারিদিকে, তার প্রতিষেধক হিসাবে টীকা নেওয়া এখুনি দরকার; এমন সত্যি-সত্যি প্রয়োজনীয় কত কাজের কথা মনে করিয়ে দেয়। তারপর উর্দ্ধশ্বাসে কর্মস্থলে পাড়ি দেওয়া। স্বয়ংগচ্ছ যানের পিঠে চড়ে যাওয়া—যা তা নম্বরে নয়—আমার জন্যে 2B, কলেজ স্ট্রীটে যাওয়ার দ্বিতল রথ। প্রত্যেক বাসের কপালে যে সাইনবোর্ডে তেলক কাটা থাকে আর সেইমত যে রাস্তা ব্যবহার হয়, তা বৈজ্ঞানিক পরিকল্পিত। একখানি প্রশস্ত রাস্তা—বিজ্ঞানের কত সেখানে গতিবেগ। কলকাতা হলে ডানদিক দিয়ে নয়—বাঁ দিক চেপে চলা। আবার এর উল্টোটা ঠিক নিউইয়র্কে। এসব এক একটি বৈজ্ঞানিক সর্ত। পুলিশ না থাকলেও লাল-হলুদ-সবুজ আলোর চোখ খোলাখুলিতে যানবাহনের চলাচলি।



ঝিনুকের বোতাম থেকে ওই মস্ত হাওড়া ব্রীজটার মধ্যে মানুষের পরিকল্পনা আছে—কত মাপজোপ হিসেব নিকেশ



নিজের হাতের বদলে মানুষ এখন যন্ত্রের হাতে কত কি করিয়ে নেয়, দশটা মানুষের কাজের জন্যে একটা যন্ত্রই যথেষ্ট

মাটির নয়, আসফাল্টের রাস্তা। সারি সারি আলো দেওয়া, গাছের মাথা রাত্রেও দেখতে পাওয়া যায়—সুসজ্জিত করবার এ চেষ্টা মানুষেরই। গ্যাসের পাইপ, জলের পাইপ, ইলেকট্রিকের পাইপ—তারা সবই জালের মত জড়িয়ে আছে, সহরের এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত। আবার বুদ্ধি খাটিয়ে রাস্তার উপর নিশান কাটা রয়েছে—কোথায় রাস্তা পার হতে হবে। কত রকম-বেরকমের সব যানবাহন—নতুন, পুরোনো। করপোরেশনের ময়লা ফেলা গাড়ীও চলেছে, আবার কোন ডেয়ারী ফার্মের দুধ-ক্রীম বেচার গাড়ী। কিম্বা ফুলে ঢাকা বরযাত্রীর গাড়ী, পাশে পাশেই চলেছে হিন্দু-সংকার সমিতির গাড়ী। বিচিত্র ফরমাসে বিভিন্ন জিনিসের উমেদারী। সব কিছুর উপর সবার রুজী-রোজগারের ফিকির—তার জন্যেই যত ছোটাছুটি। বিজ্ঞানের ফলে মানুষের নানান কাজের বহর বেড়েছে, একথা স্বীকার না করে উপায় নেই। শিল্পে যা সাফল্য, যন্ত্রে যে নৈপুণ্য, তা তো সবটুকুই বিজ্ঞানের ফলে। দশটা হাতের কাজ, এখন একটা যন্ত্রের পক্ষে যথেষ্ট। ছোট ঝিনুকের বোতামটা থেকে আরম্ভ করে প্রকাণ্ড হাওড়া-ব্রীজটা পর্যন্ত—এই রকম লক্ষ জিনিস নিয়ে মানুষের কত মাপজোপ, হিসেব-নিকেশ, নিত্য নূতন কত পরিকল্পনা।

খাস্তা খাজায়
কিম্বা বাহারে চুল ছাঁটায়

আপাতদৃষ্টিতে খাজা তৈরী আর চুল ছাঁটা যতই বিসদৃশ ও অবৈজ্ঞানিক কাজ বলে মনে হোক, আসলে এই দুই ভিন্ন-মুখী কাজের ভিতরেই যৎসামান্য বৈজ্ঞানিক জ্ঞান না থাকলে কখনও সুসম্পন্ন করা যেতে পারে না। এসব বিজ্ঞান-কেতাব-দুরস্ত জ্ঞান নয়, ব্যবহারিক জীবনের বিশেষ জ্ঞানের সম্পদ।



খাস্তা খাজায় বা বাহারে চুল কাটায়, বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞানের প্রয়োগ অনিবার্য—তা না হলে তেমন খাজাও উতরবে না—তেমন চুল কাটার বহরও খুলবে না। রোজকার জীবনে এমন কত কাজে কত রকমের ছোট বড় বিজ্ঞান রয়েছে

খাজা তৈরীর একটা সুবিন্যস্ত পদ্ধতি আছে—ময়দা মাখা থেকে পাট করে বেলা, একের পর এক সব নিয়ম। সে সব পদ্ধতি পালন করলেই তবে খাজার মত খাজা হবে। সবাই খাজা খেতে ভালবাসেন, কিন্তু কজনের হাতে তেমন খাজা উতরয়? আর তাই, যাঁদের রান্নাঘরে অবারিত গতি, তাঁরা একদিক দিয়ে রান্নাকেরামতিতে কমবেশী বিশেষ জ্ঞানী। ঠাকুরমারাও সেদিক দিয়ে বাদ যান না। অমন সুক্ত, অমন ঝালের ঝোল, অমন চচ্চড়ি—এক একজন তেমন দ্রৌপদী তাই অলিখিত বিজ্ঞান-শিল্পী। ঝাল-নুন-মিষ্টির হাত থাকা মানে যে দক্ষতা বোঝায়, সে জ্ঞানটা আহরণ করা সময়সাপেক্ষ ও বুদ্ধিনিষ্ঠ। এখানে উদ্ভাবনের কৌশলও নগণ্য বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। এই খাজা-তৈরীরই যেমন নানা জাত গোত্র আছে—রেশমী খাজা, খাস্তা খাজা, আবার গজা তৈরীরও তেমনি—জিবে, চৌক, ছানার; এসব রকমফের-এর পিছনে ভিন্নতর পরিকল্পনার যাদু আছে। সবই মগজ থেকে বার হয়, একের পর এক। আমাদের ভিয়েনে ভাল পানতুয়া হতে পারে কিন্তু ভিয়েনার ভিয়েনে পানতুয়া? নৈব নৈব চ। কিন্তু সেখানকার ভিয়েনিজ স্নিট্‌ছেল বিশ্ববিখ্যাত। তাই আমার চোখে সাধারণ পান-তৈরীর মধ্যেও ছোট একটুখানি বিজ্ঞান আছে, ঠিক ঠিক খয়ের দেওয়ায় চুন দেওয়ায়। পান থেকে চুন খসলেই তাই মুস্কিলে পড়তে হয়! তেমনি চুল ছাঁটার মধ্যেও বৈজ্ঞানিক উপকরণ সুস্পষ্ট। তা না হলে চেনা-হাতের কাছে নির্ভয়ে নিজের মাথাটা এমন করে কি এগিয়ে দেওয়া যায়! বিলক্ষণ জানি কোথায় কতটুকু ছোট বড় রাখতে হবে, তা বলার দরকার নেই। চুল ছাঁটার এই কেরামতি দিন দিন নতুন কেয়ারীতে রূপান্তরিত হচ্ছে—কখনও হলিউড্ থেকে কখনও বা টলিউড্ থেকে। তা নেওয়া না-নেওয়া অবশ্য নিজেদের মর্জি।

পটলের দোলমায়
কিম্বা হাইড্রোজেন বোমায়

লোক-খাওয়ানর জন্যে পটলের দোলমা, আর লোক-মারার জন্যে হাইড্রোজেন বোমা। কিন্তু এ দুটো জিনিসই তৈরী করতে শুধু মেহনতে কুলোয় না—সঙ্গে সঙ্গে চাই তৈরী করার কারিকুরির বুদ্ধি। একটা তৈরী হচ্ছে রান্নাঘরে, অন্যটা ল্যাবরেটারীতে। ল্যাবরেটারীও কি কিছু কম রসুইখানা। বুদ্ধি দিয়ে তৈরী করার পদ্ধতিটা আয়ত্ত করতে হয়। তবে দোলমা তৈরী করতে যতটুকু সময় ও বুদ্ধির প্রয়োজন, হাইড্রোজেন বোমার বেলায় তার লক্ষগুণ বেশী। বাজার থেকে বেছে বড় সাইজের পটল এনে তাকে কুরে, মসলাদার মাছ কিম্বা মাংসের পুর ঠেসে দেওয়া পর্যন্ত দোলমা তৈরীর কলা-কৌশল। কিন্তু অনেক অনেক সাধ্যসাধনার পর তবে জানা গেছে, কি করে হাইড্রোজেন বোমা তৈরী করা যায়। মানুষের, বস্তু সম্বন্ধে নিগূঢ়তম ধারণার স্ফটিক স্বচ্ছ দৃষ্টিকোণ থেকে এই জিনিসটির উদ্ভব। হাইড্রোজেন বোমার ভিতর যে দুর্জয় শক্তির আবির্ভাব ঘটে, তা মোটামুটি তিন রকম শক্তি থেকে। হালকা লিথিয়াম ধাতুর উপর নিউট্রন-এর ঝড় বইয়ে দিলে, দুরকম হাইড্রোজেনের উৎপত্তি হয়—হাইড্রোজেন ৩ (ট্রাইটিয়াম) ও হাইড্রোজেন ২ (ডিউটেরিয়াম)। তারপর এই দুই রকম হাইড্রোজেনে প্রচুর শক্তির সঞ্চার হয়। এই দ্বিতীয় বিস্ফোরণের ফলে একখানি নিউট্রন কণিকার উৎপত্তি হয় যা অবিলম্বে ইউরেনিয়াম অ্যাটম ভাঙ্গতে সুরু করে দেয়। এর ফলে প্রভূত শক্তির জন্ম।

এ তো বিজ্ঞানের গভীর তত্ত্বকথা—তা বার করতে অনেকদিন অনেক লোক হিমসিম খেয়ে গিয়েছিল, কিন্তু বার হল বৈজ্ঞানিক উপায়েই। এ ছাড়া অন্যধরণের হালকা বৈজ্ঞানিক উপায়ও রয়েছে

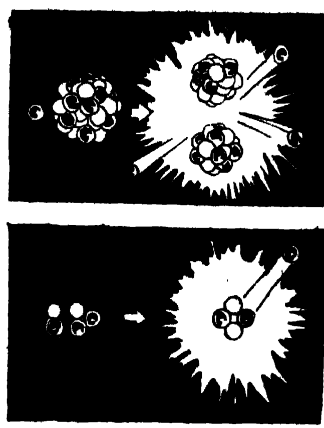
ভুরি ভুরি। শিউলি ফুলের কমলা রং-এর বোঁটা দিয়ে কাপড় রাঙান থেকে আধুনিক প্ল্যাস্টিক পেণ্ট দিয়ে ঘরবাড়ী রং করাতে যতটুকু বিশেষ জ্ঞান আছে, মাটীর তলা থেকে নল দিয়ে টিপ-কলে জল তোলাতেও ততটুকু। কমবেশী বুদ্ধির কৃতিত্ব সবখানেই। বীজাণু নাশ করতে ডি ডি টি ছড়াই, কিন্তু দই পাততে দম্বল। ম্যালেরিয়া হলে কুইনাইন খাই, কেটে গেলে আইডিন লাগাই। বড় মেসিন চালু রাখতে বলবেয়ারিং-এ তেল দেওয়া চাই, কিন্তু বেলের কিম্বা আমের সরবৎ করতে? স্রেফ অন্যরকম তরিবৎ। আবার বেলের মোরব্বা তৈরীর পদ্ধতি আর এক ধরণের। স্টেথিসকোপ বসিয়ে হৃদয়ের ভাল্‌ব খোলা বন্ধর ভাষা বুঝবার চেষ্টা চলে। আরও চলে কোন্ দূর নভোজগৎ থেকে কত শত তারার অন্তঃপুরের জ্বলন্ত বিকিরণের ভাষা বুঝার চেষ্টা। সব কিছুই বিজ্ঞানের কল্যাণে।

ঠাণ্ডায়-গরমে,
বার্ধক্যে-যৌবনে

কনকনে ঠাণ্ডায় কিম্বা ভ্যাদ্‌ভেদে গরমে, অথবা বার্ধক্যে কিম্বা যৌবনে, বিজ্ঞান সাহায্য করতে সব সময় প্রস্তুত। বেজায় ঠাণ্ডায় চাই মজাদার গরম। তার জন্যেই নানা উপকরণ—জামাকাপড়, কোট-প্যাণ্ট, মোজা, মাফলার আরও কত কি। মাথা বাঁচাবার টুপি—গান্ধী ক্যাপই হোক বা ফেল্ট হ্যাট্ই হোক। 'গ্রারম্' চা—যা তাতায় কিন্তু মাতায় না। আবার গরমের দিনে ঠিক তার উল্টো —ঠাণ্ডা না হলে বাঁচি না। চাই আইসক্রীম। সিনেমা হলগুলো তাই হয়ে উঠছে তাপনিয়ন্ত্রিত এবং বিলাসবহুল। এদেশে তত নয়, যত ওদেশে হয়েছে, তাপনিয়ন্ত্রিত বাড়ী-ঘর, দোকান, আপিস। বাইরে যখন তুষারপাত, ভিতরে তখন বসন্তের তাপ। এদিকে



বড় সাইজের পটল কিনে, কুরে তাতে মসলাদার পুর পুরে দেওয়াতেও বিশেষ জ্ঞানের দরকার—সেটা দোলমা করার বিজ্ঞান



ল্যাবোরেটারীটা কি কিছু কম রান্নাঘর! এখানে কিন্তু বিজ্ঞানের কারবারটা আরও অনেক জটিল। হাইড্রোজেন বোমা তৈরী করতে অনেক কাঠ খড় পোড়াতে হয়েছে। কি ভাবে বাইরে থেকে নিউট্রন কণিকা পাঠিয়ে অ্যাটম ভাঙ্গা সম্ভব, তা জানতে অনেক দিনের অনেক লোকের অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষার দরকার হয়েছে

যখন 'বারি ঝরে ঝরঝর…' তখন বর্ষার সাথী বর্ষাতি—এটিও একটি বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবন।

বার্ধক্যেও বিজ্ঞানের দ্বারস্থ হতে হয়। 'চুল পাকলে কান্দ কেন' বলে এখন আর বসে থাকতে হয় না। পাক ধরলে তখন কলপের খোঁজ পড়ে। আর দাঁত পড়লে হাসবার জন্যে নয়, নিদেন চিববার জন্যেও চাই নকল-দাঁত। বাতের ব্যথা যখন শুধু মালিশে শানায় না তখন ডাক্তারের দেওয়া নানান দাওয়াই-এর শরণাপন্ন হতে হয়। এ ছাড়া শরীর তরিবৎ রাখার জন্যে এ দাওয়াই সে দাওয়াই তো আছেই। বার্ধক্যে বিজ্ঞান যদি কোষাকুষির কাজ করে থাকে, যৌবনে তাহলে বলতে হয় পুষ্পধনুর। লাবণ্য-চর্চা রীতিমত বিজ্ঞান-নবিশী। আগে ছিল সর-ময়দা আর মেদির পাতা, এখন ক্রীম ঘষায় কিম্বা নখ পালিশ করায় বিজ্ঞান এসে পড়ে। এর উপকরণের সংখ্যাও এত রকম যে গুণে শেষ করার নয়। আর পাশ থেকে কিম্বা মাঝ থেকে টেরি কাটাটাও মাথা-জরিপের সমান—তা সম্ভব বিজ্ঞানের অবদান চিরুণীর জন্যে। তেমনি লীলায়িত ভঙ্গিমায় বেণী বাঁধতে যতখানি 'আর্ট' থাকুক, বাঁধবার কৃতিত্বটুকু পুরোমাত্রায় 'সায়েন্টিফিক আর্ট' বা বৈজ্ঞানিক শিল্পের কেরামতি। চাটাই বিনুনী, খেজুর-ছড়ি বিনুনী, তিনগুচি বিনুনী, পাঁচগুচি বিনুনী—এতরকম বিনুনী কি করে সম্ভব ? শুধু বিনুনী কেন খোঁপাতেও। আর খোঁপা কি এক রকমের ? এলো, কলকা, অমৃতি—সে কত কি কীর্তি। শুধু চুল বাঁধা কেন ? কেশসমৃদ্ধির জন্যে চলে নানারকম চেষ্টাচরিত্র—চামড়ার তলায় লোমকূপের নীচে অজস্র কেশবৃন্তকে রাসায়নিক উপায়ে সতেজ রাখার ভাল উপায় বার হয়েছে। গভীর মনোযোগ সহকারে অণুবীক্ষণের তলায় অদৃশ্যলোকের রহস্য সন্ধান করায় যত গুরুগম্ভীর বিজ্ঞান-চর্চা থাকুক না কেন, চোখের কোলে কাজল টানার উপকরণে এবং উপচারে যে বিজ্ঞানের হাত আছে, তা নেহাৎ



লীলায়িত ভঙ্গিমায়, চিরুণী হাতে নিয়ে, বহুবিধ উপকরণের সামনে লাবণ্য-চর্চা করাটাও অবৈজ্ঞানিক কিছু নয়



গভীর মনোযোগের সঙ্গে অণুবীক্ষণের সাহায্যে অদৃশ্যলোকের অনুসন্ধান করা তো পুরো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি

উড়িয়ে দেবার নয়। বিজ্ঞানের সাফল্য আরও অন্যদিকেও স্পষ্ট। এ কথা আমরা বিজ্ঞানের কৃপায় জেনেছি যে, পুরুষের পুরুষালি আর মেয়ের মেয়েলি ভাবটুকু আসলে তুরকম রাসায়নিক ক্রিয়ার প্রতিফলন; পুরুষের বেলা টেস্‌টোসট্রোন আর মেয়েদের বেলা এস্‌ট্রোজেন—তুজনের আসল জৈব-রসায়ন। প্রয়োজনবোধে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে বাইরে থেকে হর্মোন চিকিৎসা করে, অবরুদ্ধ যৌবনকে প্রকাশ করা সম্ভব—সৌকুমার্য এনে দেওয়া সম্ভব। আর নিতান্ত শিশু অবস্থায় বাড়ের জন্যে দরকার হয় ভাইটামিন 'ডি'। ভাইটামিন অভাবে পূর্ণাঙ্গ অবয়ব তৈরী হওয়ায় বাধা পড়ে। ভাইটামিন চিকিৎসা করে রিকেট ভাল করা এখন নিতান্ত সাদাসিদে ব্যাপার। তিনকালেই বিজ্ঞানের কারচুপি। কাজ হালকা হোক আর ভারী হোক—বিজ্ঞান তলে তলে তাল সঙ্গত করে চলেছে।

এনসাইক্লোপিডিয়া থেকে এনটিসেপটিক

এনসাইক্লোপিডিয়া আর এনটিসেপটিক, এ তুই-ই আমরা পেয়েছি বিজ্ঞানের দরুন। চুন-সুরকির নয়, জ্ঞানের আড়ত হল এনসাইক্লোপিডিয়া। বহুদিন আগে থেকে বহু মানুষ চেষ্টা করেছে, কিভাবে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত জ্ঞানের টুকরোকে এক জায়গায় জড়ো করে, একটি সুন্দর রত্নমালা তৈরী করা যায়। সেই কোন আদিম যুগে যীশু জন্মাবার সাতাত্তর বছর পরে, প্লিনি বিশ হাজার তথ্য সম্বলিত প্রথম এনসাইক্লোপিডিয়া রচনা করেন—নাম দিয়েছিলেন 'ন্যাচরাল হিসট্রি'। তারপর ১৬২০ সালে ইয়োহান হাইনরিখ আলস্টেড (Johann Heinrich Alsted) 'এনসাইক্লোপিডিয়া সেপটাম টোমিস ডিসটিংটা' প্রকাশ করলেন। এরপর ইংরেজি, ফরাসী, জার্মান, ইটালিয়ান ও রাশিয়ান



বিক্ষিপ্ত জ্ঞানকে সঙ্ঘবদ্ধ করে জ্ঞানী-গুণীরা লেখেন এনসাইক্লোপিডিয়া—ভাষা বিজ্ঞানের সাহায্যে ছাপা খানার অক্ষরে



ডাক্তার কান পেতে শোনেন আর এক রকম ভাষা—হৃদ্‌যন্ত্রের ভাষা, রোগের না নীরোগের

ভাষায় নতুন নতুন এনসাইক্লোপিডিয়া বার হয়েছে। কিন্তু আমাদের নিজেদের ভাষায় এমন গ্রন্থ আজও প্রকাশিত হয়নি। একই জ্ঞান পরিবেশন করতে গিয়ে নানান ভাষার আশ্রয় নিতে হয়। তাই এনসাইক্লোপিডিয়ার নাম কখনও রাখা হয়েছে এনসাইক্লোপিড়িয়া ব্রিটানিকা, কখনও এনসাইক্লোপিড়িয়া ঃ উন্ দিক্সিওনেয়ার রেজন্ দে সিয়ঁাস, দেজর্ত এ দে মেতিয়ের অথবা কনভারসেসন—লেক্সিকো কিম্বা বলসাইয়া সোভেসটা-কসিয়া এণ্টসিকলোপিড়িয়া ইত্যাদি। পৃথিবীর নানান ভাষা, তার প্রয়োগের রীতিনীতি, উচ্চারণের কৌশল, একে বারে বিজ্ঞানের সদর বিভাগের অধীনে। ভাষা-বিজ্ঞানে ফাইলোলজি সায়েন্স হয়েও আর্টসের ভিতর। ব্যাকরণ বেঁধে দিয়েছে কর্তার সঙ্গে কি কর্ম যাবে, তাতে কি বিভক্তি যোগ হবে, তার নড়চড় নেই—নানা ভাষায় এর নানারকম ব্যবহার। বাঙ্গলায় 'আমি বলছি',—'বলছেন' নয় 'বলছিস' নয়—'বলছি'। তেমনি ফরাসীতে Je dis আর সংস্কৃততে অহং বদামি; জার্মানে Ich sprech। তেমনি তুমি 'বলছ'—Tu dit আর ত্বং বদসি—Du spricht। তাই নরঃ, নরৌ, নরাঃ, বা তে, য়তে অন্তে, আর Go, went, gone, প্রভৃতি শেখা প্রথম দরকার নির্ভুল শব্দ প্রয়োগের কৌশল আয়ত্ত করবার জন্য। এইটাই ভাষা-বিজ্ঞান—$(a+b)^2=a^2+b^2+2ab$ শেখার মতই নির্ভুল সঙ্কেত এতে আছে। তারপর ব্যাকরণের 'শুষ্কং কাষ্ঠং' জানার পর সত্যি সাহিত্যিকের হাতে 'নীরস তরুবর' লিখে মানুষের মনকে বিমল আনন্দে সুধাসাগরে ভাসায়ও। কিন্তু সে সাগরে ভাসতে গেলে চাই নিখুঁত ভাষা বিজ্ঞানের নৌকা—তা না হলে সব ভরাডুবি।

সবচেয়ে বড় কথাটা হল প্রয়োগের পদ্ধতি, ভাষাতেই হোক বা অন্য কিছুতেই হোক। পেনিসিলিয়াম নোটেটাম থেকে

পেনিসিলিন বার করে এনে বীজাণু মারার সময় নাশক হিসাবে ব্যবহার করি—এ বহুদিনের বহু পরিশ্রমের ফল। কিন্তু এখন আমরা শিখেছি প্রয়োগ করবার নানান কৌশল। শুধু পেনিসিলিন কেন? আরও কত কি—সেপটো-ওরিয়ো-সালফা। রোগ-ঠাণ্ডা করবার অদ্ভুত সব ওষুধ। ভাষা লিখতে ও শিখতে যেমন, এনটিবাইয়োটিকস তৈরী শিখতেও তেমনি, অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়। শুধু এই সবই নয়, আরও অনেক কিছু আছে। এক অভ্র, তার ব্যবহার বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতিতে অশেষ। তেমনি গানেও বিজ্ঞান আছে। সুরের যত লালিত্যই থাকুক, তাকে চলতে হয় 'সারেগামাপাধানিসা'র পথ দিয়ে—এই সব পর্দার উপর দিয়েই চলা-ফেরা, ওঠা-নামা, দাঁড়ান; সুরের বিশুদ্ধতা নির্ভর করে বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে সময়ের রাশটানা ও ছাড়ার উপর। অনন্ত সুরসাগরের মাঝে সারেগামাপাধানিসা বিশুদ্ধতা বাঁচানর জন্যে ছোট ছোট দ্বীপ।

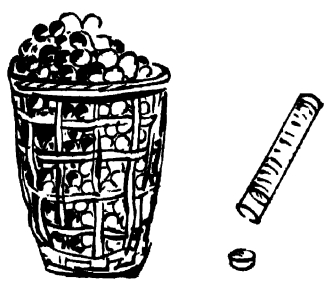
না-দেখেও দেখা
না-শুনেও শোনা

এখন এমন উপায়ও বার হয়েছে যার ফলে না-দেখেও দেখা সম্ভব। না-শুনেও শোনা। না-থেকেও থাকা। এসব কোন আধিভৌতিক কার্যকলাপ নয়—নিতান্ত সাদাসিদে নিত্যকার ব্যাপার। এত সাদামাটা যে রহস্য বলে এর ভিতর কিছু যে আছে তা মনেই হয় না। ধরা যাক, না-দেখেও দেখার ব্যাপারটা। নিজের চোখে যে জিনিস জীবনে কখনও দেখিনি—সেই জিনিসই যাঁতাকলের ভিতর দিয়ে যখন বার হয়ে আসচে, তখন দিব্যি নিজের চোখটা দিয়ে পরখ করে দেখছি। এমন হাজার দৃষ্টান্ত আছে, ছায়াছবির জগতে এমন তো হামেসাই ঘটছে। কজন

লোকের ভাগ্যে হিমালয়ের শিখর দেখা চাক্ষুষ ঘটবে? কিন্তু সিনেমার দৌলতে, রিলের পর রিল তুলে আনা হল হিমালয়ের জয় অভিযান—সবার দেখার জন্যে। শুধু হিমালয়ই বা কেন—এমন কত জায়গা যার দূরত্ব খুব বেশী, এমন কি আমাদের পক্ষে অগম্য বা দুর্গম হলেও তা আমরা কলকাতায় বসে বসেই দেখতে পাচ্ছি। এসব না-দেখে দেখা—ফাঁকতালে দেখে নেওয়া। ক্যামেরার চোখে দেখা। তেমনি কলের গানের দৌলতে, না-শুনেও কত কিছু শোনা সম্ভব। ফৈয়জ খাঁর কণ্ঠস্বর, কখনও কানে পৌঁছয়নি আসরে বসে। কিন্তু কলের গানের সাহায্যে রেকর্ড বাজালেই তো যখন খুসী শুনতে পাওয়া যায়। তেমনি, রবীন্দ্রনাথের আবৃত্তির রেকর্ড বিদেশীরা এসে এখান থেকে কিনে নিয়ে যায়। মহাকবির কণ্ঠস্বর সেলুলয়েডের বুকে আঁচড়ে আঁচড়ে বাঁধা পড়ে আছে—তাই আসলে না-শুনেও শুনতে পাওয়া সম্ভব। ভারী ভারী সব মিটিং-এ বড় বড় লোকের বক্তৃতা টেপ-রেকর্ড করে এনে, পরে তা শ্রোতাদের শোনান হয়। এখন নাটককে নাটক পর্যন্ত আগে থেকে রেকর্ড করে, পরে তা 'রীলে' করা হয়—অভিনেতা-অভিনেত্রীরা পায়ের উপর পা তুলে দিয়ে, বাড়ী বসে শুনতে পান, তাঁরা কেমন অভিনয় করছেন—মানে করে এসেছেন। তেমনি ঘটনাস্থলে উপস্থিত না-থেকেও থাকা চলে কোন ঘটনার মাঝে। এর জন্যে দরকার টেলিভিশন। কোথায় কোন সুদূরে ঘটনাটি ঘটছে—সেটিকে তুলে এনে নিজের ঘরের মধ্যে এমনভাবে ঘটান সম্ভব যে, তখন নিজেকেও সে ঘটনার একজন সাক্ষী করে তোলা যায়। কোথায় মাঠের ফুটবল খেলা—তা টেলিভিশনের সাহায্যে নিজের ঘরের মধ্যে প্রত্যক্ষ করছি—ব্যাক্ বল মিস্ করলে পা উস্‌খুস্ করে উঠছে। সে খেলায় আমিও যেন একজন। মানুষের জীবনের



সত্যি চোখে না-দেখেও দেখা যায়, ক্যামেরার চোখে কাছে-দূরের কত কি জিনিস—এ সব বিজ্ঞানের কৃপায় না-দেখেও দেখা



তেমনি কমলালেবু না-খেয়ে ভাইটামিন 'সি' খেলে কমলালেবু খাওয়ার কাজ হয়—এ হল না-খেয়েও খাওয়ার সামিল

নানান রং-বেরং-এর অনুষ্ঠানে থেকে বা না-থেকে, দেখে বা না-দেখে, শুনে বা না-শুনে তার চিরন্তন সাক্ষী আমরা। তাতেই মানুষের কৃতিত্ব, তার তৃপ্তি। সবচেয়ে বড় কথা, অন্ধজনেও আঙুলের সাহায্যে পড়ে জ্ঞানের আলো দেখতে পাচ্ছে—তারা জন্মান্ধ হলেও, মনে তাদের আলো ফুটছে।

নকলও
আসলের সামিল

আসল নাই বা হল, নকল এখন মানুষের হাতে আসলের সমান। দিন-দিন এমনভাবে সব গড়াচ্ছে যে, আর খুব বেশী দেরী নেই, যখন আসলে আর নকলে কোন প্রভেদই থাকবে না। এও বিজ্ঞানের কেরামতি। কমলালেবু না খেয়ে মানুষের তৈরী ভাইটামিন 'সি' যুক্ত বিশেষ খাদ্য খাওয়া, স্বাস্থ্যের দিক থেকে প্রায় একই কথা। কথায় আছে—দুধের সাধ ঘোলে মেটান। কিন্তু মাখনের সাধ মারজারিনে বহু লোক যুদ্ধের সময় স্বেচ্ছায় না হলেও বাধ্য হয়ে মিটিয়েছে। আজও প্রয়োজনে মেটায়। আবার তেমনি ডায়াবিটিস হলে বাইরে থেকে ইনসুলিন ইনজেক্‌সন্ নিলে শরীরের ভিতরকার চিনির কারবার ঠিক রাখা সম্ভব। পায়ে পায়ে সিঁড়ি না-ভেঙ্গে, এমন কল এখন বার হয়েছে যার উপর দাঁড়িয়ে থাকলে আপনি উপরে ওঠা যায়—এ নকল-চলা আসল-চলার চেয়ে কম কি? লণ্ডনের বিখ্যাত এস্‌কেলেটার বা লিফট—এ সবেতেই না চলেও চলা যায়।

তারপর আরও রয়েছে উদাহরণ। নানান রকমের সব ফাইবার—কাপড়ের নকল-দোসর। যাকে সাধারণভাবে সিনথেটিক ফাইবার (পলি-আমাইড) বলা হয়। সূতি রেশমের কাপড়কে স্রেফ হার মানায়—চাকচিক্যে এবং লালিত্যে। এ ছাড়া আসলের উপর মানুষ

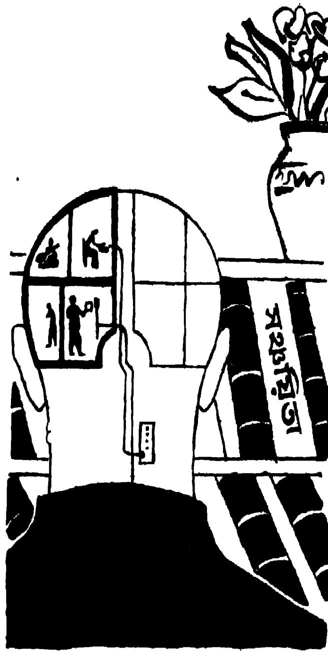
ধীরে ধীরে প্রয়োজনবোধে নানান ইচ্ছামত নকল জিনিস স্থাপনা করছে। নকল-চোখ। নকল-পা। নকল-হাত। নকল-জয়েন্ট। এ সবই এখন হওয়া সম্ভব। নকল-মানুষ কিন্তু এখনও প্রাণ পায়নি। কিন্তু মানুষের দেহটার উপর খোদকারির অন্ত নেই। বাঁকা নাক সোজা হচ্ছে। তোবড়ান গাল নিটোল হচ্ছে। ক্ষতের দাগ সাফ হচ্ছে। সবই প্লাসটিক সার্জারীর সাফল্যে। প্রকৃতিতে বিভিন্ন রকমের জিনিস আছে, মানুষ তাদের সবাইকে নিজের মনোমত করে তৈরী করার বাসনা রাখে। প্রকৃতিতে পাওয়া যায় এমন হাজারো জিনিসের মধ্যে মানুষ কিছু কিছু জিনিস ইতিমধ্যেই নিজে তৈরী করতে সক্ষম হয়েছে, গবেষণাগারে নানা রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে। এ সব হল মানুষ-সৃষ্ট অণু।

মগজে
আর কাগজে

প্রথমে মগজ তারপরেই কাগজ। এই দুয়ের সাহচর্যে মানুষের এগিয়ে যাওয়া। এই দুয়ে মিলে সভ্যতার এত কীর্তি এত সমারোহ। মগজ যা ভাবে, কাগজ তা রূপ দেয় হরফের ছাঁদে। আমার মর্মে যে কথা ছিল তা কাগজে কলমে লেখার পর, আর কি গোপন রইল? কত লোকের কত ভাবনা—কাজের বা অকাজের—সব ধরা পড়ে। কাগজের বুকের ভিতর থেকে, একদিক থেকে দেখলে, অনেক কালের অনেক মনের কথা আমার মাথার মধ্যে এসে আজও ঘুর-ঘুর করছে। পূর্বপুরুষের অভিজ্ঞতা বিস্মৃতির বালিচাপা পড়ে না। কারণ যা লিপিবদ্ধ হয় তা উত্তরকালের জ্ঞান-ভাণ্ডারের জন্যে সঞ্চিত থাকে। আগে মুখে মুখে মানুষের মনের ভাবনা চলে বেড়াত এবং বেঁচে থাকত। তাই তখন বলা হোত শ্রুতিধর। কিন্তু এখন আমরা লিপিধর। মগজই কাগজ আবিষ্কার করেছে। প্রায়

আড়াই হাজার বছর আগে, চীন দেশে এর সূত্রপাত। তারপর কাগজ তৈরীর এবং উন্নতির বিরাট এক ইতিহাস। গৃহকোণের এক পাশে বসে রবীন্দ্রনাথ এক খণ্ডই গীতাঞ্জলি লিখলেন। কিন্তু প্রত্যেক ঘরে ঘরে ছেয়ে গেল গীতাঞ্জলি; ভাগ্যি ছাপার কৌশল আবিষ্কার হয়েছিল। শুধু বাঙ্গলায় কেন—তাঁর রচনার নানা ভাষান্তর হল। কাগজের ভিতর দিয়ে রবীন্দ্রনাথের মন বিশ্বের দরবারে উন্মুক্ত হয়ে গেল। ভূর্জপাতা-তালপাতার আমল থেকে এখনকার ছাপাখানা—এ ক্রমপরিণতিও বিজ্ঞানের সাহায্যেই সম্ভব হয়েছে।

কাগজের কথা হয়তো বোঝা যায়, কিন্তু মগজের কথা অত সহজে নয়। দেহের মধ্যে সবচেয়ে করিৎকর্মা যে জিনিসটি তার অস্তিত্ব টেরটি পাওয়া যায় না এমনিতে, কিন্তু যখন মাথা-ধরে? তখন? তখন দৌড়তে হয় সারিডন কিম্বা অ্যানাসিন অথবা অ্যাসপ্রোর উদ্দেশ্যে। মাথা যে ধরেছে তাকে ছাড়াবার জন্যে। মগজের মুন্সীয়ানা কি চারটিখানি কথা! মাথা কত কিছুর দ্রব্য-গুণ বোঝে—কাজে-অকাজে তার ব্যবহার জানে। লেখককে লেখায়, পাঠককে পড়ায়, শিল্পীকে আঁকায়, ডাক্তারকে ডাক্তারী করার—ভাবনার মূলে ঘা দেয়; এক কথায় দুনিয়াকে চালায়। নতুন উদ্ভাবনের পরিকল্পনা করায়। বুদ্ধির জোরে সব সত্যি হয়। এখন সেই মগজের রীতিমত পরীক্ষা সুরু হয়েছে। দেখা গেছে রেডিয়াম-ইউরেনিয়াম পদার্থের মত মানুষের মগজ থেকে এক রকম অদৃশ্য বিকিরণ ঘটে। এই বিকিরণ অনেকটা আলট্রা-ভায়লেট রশ্মির মত, এর একটা বিশেষ তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য (wave length) আছে। বিজ্ঞানীরা এ সব হিসাব করে থাকেন বায়োমেট্রিক প্রথা দিয়ে। লোকের প্রতিভা, জ্ঞান-গরিমা, কর্মদক্ষতা, সৃজন-ক্ষমতার সঙ্গে মগজ থেকে বিকিরণের তারতম্যও

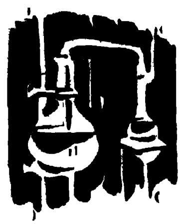


এ পৃথিবীর সেরা জিনিস দুটো, মগজ আর কাগজ। মাথা হল ধ্যান-ধারণা, ভাবনা-চিন্তা, উদ্ভাবনা-পরিকল্পনার কারখানা—সেখান থেকেই নানান অনুভূতির যত আলোড়ন। কাগজে তারই প্রতিচ্ছবি দেখতে পাওয়া যায়—একের মন অন্যের কাছে অবারিত করে দেওয়ায়। সেই মগজ নিয়ে এখন অনেক বিচার-বিবেচনা সুরু হয়েছে

দেখা যায়। বিকিরণের হার হল অনেকটা এমনি: অবিনশ্বর প্রতিভা—৭৮০, অসাধারণ মেধা—৬৪০, বিরাট ব্যক্তিত্ব—৫০০, খ্যাতনামা জননেতা—৪৪০, তীক্ষ্ণবুদ্ধি—৪০০, বুদ্ধিজীবী—৩৬০, বাস্তববাদী—৩০০, সাধারণ লোক—২৪০, অল্পবুদ্ধি—২২০, বিকৃতমনা—২০০, বুদ্ধিহীন—১৮০। শেখা, দেখা ও ভাবা এ সবই চেতনমনের কাজ। চেতনমনের সঙ্গে অবচেতনমনের ত্বরিত-যোগাযোগটাই বুদ্ধিমত্তার লক্ষণ। মনো-বিশ্লেষণের বহু পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে—তার মধ্যে এই বিকিরণ মাপজোপ নানান ভাবে প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে। মস্তিকের বিদ্যুৎলেখযন্ত্রের সাহায্যে বৈদ্যুতিক তরঙ্গাবলীর রূপ দেখলে লোকটির মস্তিষ্কে চিন্তা, একাগ্রতা, আনন্দ, বিমর্ষ—কোনটির ঘনঘটা চলেছে তা বলা চলে। অনেক সময় মাথায় টিউমার বা অন্য রোগ হলেও বিদ্যুৎলেখযন্ত্রে তা ধরা পড়ে। মগজের সব তথ্য যখন ভবিষ্যতে একের পর এক বিজ্ঞানীরা উদঘাটন করবেন, তখন আবার কাগজে তাদের আঁচড় কেটে সবার সুমুখে আনতে হবে। মগজ আর কাগজ তাই এ দুনিয়ার সবচেয়ে দরকারী সামগ্রী।

বিজ্ঞানে
বিষও আছে, অমৃতও

দেখা গেল, এখনকার সমাজ কমবেশী বিজ্ঞানের বাঁধনে এমনভাবে জড়িয়ে পড়েছে যে, তা থেকে মুক্তি পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। প্রতি পা ফেলতে বিজ্ঞানের সাহায্য না হলে আমাদের চলে না। কিন্তু তা বলে বিজ্ঞান এতদিন যত কিছু করেছে, তার সবকিছুই যে সারল্যে এবং মাধুর্যে আমাদের জীবনকে ভরে দিয়েছে, এমন বলা চলে না। কিন্তু এ কথা নিশ্চয় করে বলা চলে যে, বস্তুর ভিতরকার বিস্ময়কর জগতের আভাস আমরা বিজ্ঞানের কাছ থেকেই পেয়েছি। এ পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ



বিজ্ঞানের ভালও নেই, খারাপও নেই—এটা একটা হাতিয়ার মাত্র। কে কেমন ভাবে কোন কাজে লাগাচ্ছে সেইটেই বড় কথা



সবাই আমরা সব তো বুঝছি, কিন্তু বেড়াল-তপস্বীর গলায় শুভ-বুদ্ধির ঘণ্টা কে বাঁধবে, সেইটেই এখন প্রশ্ন

নির্মাতা হবার অভিলাষটুকুও বিজ্ঞানের সাফল্য থেকেই আমাদের পেয়ে বসেছে। এক দিক দিয়ে দেখলে বিজ্ঞানের কোন দোষ-গুণ, ভাল-মন্দ কিছুই নেই—বিজ্ঞান একটা হাতিয়ার মাত্র। কি কাজে, কেমন ভাবে, কে ব্যবহার করছে, তার উপরই নির্ভর করে এর সুফল কিম্বা কুফল। সম্পূর্ণভাবে মানুষের—ব্যবহারের—মাঝেই-নির্ভরশীল বিজ্ঞানকে আমরা অমঙ্গলের ভগ্নদূত হিসাবে দেখব না, দেখব সুখ-সম্প্রীতি-সৌভাগ্যের পথিকৃৎ হিসাবে।

মানুষের এতদিনের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা কখনই নিষ্ফল হয়ে যেতে দেওয়া চলে না। কুচক্রীরা বিজ্ঞানকে মানুষ-মারা কল হিসাবে নির্বিচারে ব্যবহার করতে উদ্যত ; আর সত্যসন্ধানীরা চান সুন্দর পৃথিবী গড়ার উপায় হিসাবে নিয়োগ করতে। সবচেয়ে আশ্চর্য বিজ্ঞানের দেশ-পাত্র-মিত্রের বালাই নেই। তবু বিজ্ঞান নিয়ে এত দ্বিধা, এত ভিন্নতা, এত গোঁড়ামি, এত রেষারেষি, এত অশান্তি। এর থেকেই যত বিভীষিকা। বিজ্ঞান পার্থিব জীবনে এত কিছু করেছে, তবু মানুষের মনের ময়লা দূর করবার কোন উপায় আজও বার করতে পারে নি। ডাইনামো, ষ্টিল-প্ল্যাণ্ট, বিজলী বাতি তৈরীর চেয়ে মন-শুদ্ধির উপায় আরও অনেক ঝকমারি ব্যাপার। অথচ মানুষের মাথা, তার ইচ্ছা বিজ্ঞানের অসীম শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করছে। কত মূককে বিজ্ঞান মুখর করেছে, কত নিহিতকে নিষ্কাশিত, কত প্রচ্ছন্নকে প্রকাশিত ; তবু আমরা আমাদের নিজেদের চিত্ত-কুহরে সম্পূর্ণ প্রবেশ করতে আজও পারি নি। পারবো না কোন কালে, তা ভাবতে চাই না। মানুষের নিজের মধ্যেই ছিটে-ফোঁটা শুভবুদ্ধি আছে—বিজ্ঞানের অপচয়ে বিশ্বজুড়ে কি বিষ ছড়াতে পারে, সে সম্বন্ধে কে না সচেতন। আর, বিজ্ঞানের অবদানে অমৃতময় রূপটার পরিচয় আজ তো সবার জানা। বিজ্ঞানের দায়িত্ব অনেক।

এখনও পৃথিবীর অর্ধেক লোক লিখতে পড়তে জানে না।' তাই, তার বিরুদ্ধে যেমন অভিযান প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন ক্ষুধার বিরুদ্ধে, অস্বাস্থ্যের বিরুদ্ধে। সারা পৃথিবীর চার ভাগের মাত্র এক ভাগ জায়গার বেশীতে ভাল বৃষ্টি হয় না। পৃথিবীর অর্ধেক লোক ভাল করে আজও খেতে পায় না। স্ত্রী পুরুষের মধ্যে সম-অধিকার আজও পৃথিবীর সর্বত্র আসে নি। বছর বছর সারা বিশ্বে লোক সংখ্যা হু হু করে বেড়ে চলেছে। এদের খাদ্য সংস্থান চাই। রোগ, শোক, জরা, বিকারের বিরুদ্ধে মানুষের নিত্য-নতুন অভিযান। এ সবের প্রতিকারের চাবিকাটি বিজ্ঞানের ভিতরই আছে। কিন্তু বিজ্ঞান নিয়ে মাত্রাজ্ঞানের ঘণ্টা, বিড়াল-তপস্বী সব রাজনীতিবিদদের গলায়, কে বাঁধবে? তাঁরাই তো সব দেশে বিজ্ঞান ব্যবহারের এখন মালিক—এক্ষেত্রে বিজ্ঞানীরা নিজেরা কতটুকু! বিজ্ঞানের জোরেই তাঁদের এত মদমত্ততা।

বলিহারি
এ দুনিয়াদারি

গলায় শুভবুদ্ধির ঘণ্টা বাঁধা হবে কিনা তার যেমন ঠিক নেই, এ পৃথিবী সম্বন্ধেও তেমনি শেষ কথাটির শেষ নেই। ঘটনা উড়ে চলে আকস্মিকের রথে। কোথা থেকে কি হয়ে যায়, তা কে বলতে পারে? জীবনটার সৃষ্টিও তেমনি অতর্কিতে—জেনে-শুনে-বলে তো কেউ প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করেনি। অদৃশ্য সব পরমাণুরা কাছে এসে গিয়েছিল, যার ফলে সৃষ্টি হল জীবন্ত অণুর। সেই এক জীবন্ত অণুর অনুসরণে কালক্রমে এত জীবের উদ্ভব—মানুষ পর্যন্ত। ঘটনার সংঘাতে সব-কিছুই আপনি-আপনি অভিব্যক্ত হয়েছে। আর সব কিছুর সেরা হল এই মানুষ। কিন্তু এই বিপুল বিশাল মধুর, ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে পৃথিবী বা ক-ত-টু-কু? ধূলিকণার সামিল।

বড় বড় গ্রহ-উপগ্রহের তুলনায় ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র। সেখানকার বাসিন্দে মানুষ। আবার একটা মানুষের সারা জীবনের ভিতর একটা দিন তাও কিন্তু উপেক্ষার নয়। কারণ, পৃথিবী সৌরজগতের মধ্যে সামান্য এক তৃতীয় শ্রেণীর গ্রহ হতে পারে, কিন্তু সেখানকার মানুষ? প্রথম শ্রেণীর এক অসামান্য জীব। বুদ্ধির প্রাখর্যে সে অনন্য। শুধু নিজের ভাগ্যপ্রতিষ্ঠাতা নয়, নিজের ভবিষ্যতের সে স্রষ্টিকর্তাও। কোটি কোটি বছর ধরে প্রকৃতিতে চলেছে নিঃসীম শূন্যে অণুর উত্তরায়ণ, আর মানুষের দেহের মধ্যে বিবর্তনের ভিতর দিয়ে উড়েছে বুদ্ধির বৈজয়ন্তী। একজন মানুষ, তার কর্মের সাফল্য, চিন্তার ঔদার্য, ভাবের উল্লাস, সব কিছু নিঃশেষে ঢেলে দেয়, বিশ্ব-সংসারের অনন্তের দিকে ছুটে যাওয়ার পাথেয় হিসাবে। তার দাম বা কতটুকু! সত্যিই কি কিছু নয়? কিন্তু এমনি করে একের পর এক, কত মানুষের মিছিল—সব মিলিয়ে তাদের অবদান স্বল্প নয়। সব কিছুই উত্তরপুরুষের জন্যে সঞ্চিত থাকে, এই মানুষজীবনকে ধন্য করবার জন্যে, আরও মহিমান্বিত করবার জন্যে। সবাই আমরা চলেছি তো চলেছি, অলক্ষ্যের পানে—এক একটি জীবন, মনুষ্যত্ব উন্মোচনের হোমকুণ্ডে এক একটি আহুতি। এমন বহু মানবের সংহত জ্ঞান দিয়ে ভাবীকালের মানুষের পক্ষে বৃহত্তর সিদ্ধির চরিতার্থতা খোঁজা। বিশ্বের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে, এই পৃথিবীতেই সুন্দরের সোনার কাটির স্পর্শে স্বর্গসাধনার বাসনা। বিরাট শক্তি এখন মানুষের করায়ত্ত—তা দিয়ে মানুষ ইতিমধ্যে যতটুকু করেছে তার আরও শতগুণ পাওয়ার ও করবার আশা রাখে। জলে-স্থলে, আকাশে, সদাসর্বদা তার দুর্জয় আহ্বান—কালের অবগুণ্ঠন সরিয়ে অদৃষ্টের মুখ-দর্শনের জন্যে ভবিষ্যতের মানুষ কি করতে পারবে, সে কথা আজ এখন কে বলবে? স্রষ্টার মনোভাব নিয়ে সে এখন সব কিছুকে স্পর্শ করতে চায়, শুধু এ

বিজ্ঞানের স্বয়ংম্বরা প্রতিদিন প্রতিক্ষণ

…মে	জন্মবিজ্ঞান, মাতৃমঙ্গল, শিশুর বংশানুক্রম তদারক, মিল্কি পাউডার
…রণে	ওষুধপত্তরের সাহায্যে জরা-মৃত্যুর সঙ্গে রেশারেশি—সালফা-ওরিও-স্টেপটো, পেনিসিলিন কুইনাইন প্রভৃতিরা হাতিয়ার। বসন্ত-কলেরার টীকা। কৃত্রিম উপায়ে সেল-কালচার
শয়নে	খাট, বিছানা, তোষোক, বালিস, নানান আসবাব। মাথা-গোঁজবার সংস্থান—পাকা ঘরদোর
স্বপনে	পুষ্পকরথ আজ কমেট প্লেন। চাঁদের দেশের বুড়ী তার পৃথিবীর নাতি নাতনীদের হাতছানি দিয়ে কেবল ডাকে
বসনে	সুতি, সিল্ক, উল আর নানান সিনথেটিক পরিধেয় সামগ্রী—নিত্যনূতন ফ্যাসানের উদ্ভব। লাবণ্য-চর্চা
ভোজনে	শুধু খাওয়া নয়—বিজ্ঞান সম্মত ভাবে ব্যালেন্সড্ ডায়েট খাওয়া ; কতটুকু ফ্যাট বা কারবোহাইড্রেট বা প্রোটিন বা ভাইটামিন। ঠাণ্ডায় গরমে মিষ্টিতে কি তেতোতে। খাদ্যদ্রব্যের সংরক্ষণ
ভ্রমণে	স্থলেজলে অন্তরীক্ষে দ্রুত ভ্রমণের নানান উপকরণ, হাওয়াই জাহাজের নকশা, কংক্রিটের রাস্তা, সমুদ্রে কম্পাস, বিদ্যুৎবাহী রেল ইঞ্জিন। দূরত্বের ব্যবধান সঙ্কুচিত
পঠনে	এনসাইক্লোপিডিয়া, গীতাঞ্জলি আরও কত গ্রন্থ—ভাষা থেকে ভাষান্তরিত, রোটারী-টেলিপ্রিন্টার সাহায্যে দেশ দেশান্তরে সংবাদ সরবরাহ
লিখনে	মনের ভাব প্রকাশের নানান উপকরণ—উড পেনসিল থেকে ঝরণা কলম, কালী, কাগজ। টাইপ-রাইটার ; মোনো, লাইনো মেসিন ; কপি করার কারবন
কথনে	কণ্ঠস্বরের জন্যে নানান স্বরবিন ট্যাবলেট, টেলিফোন, মাইক্রোফোন, ডিকটাফোন
শ্রবণে	কাছে না থেকেও দূর থেকে রেডিও, না শুনেও রেকর্ড শোনা। কম শুনলে হেড-ফোন
দর্শনে	কম দেখলে চশমা ; বড় করে দেখতে অণুবীক্ষণ, দূরবীক্ষণ। না দেখেও দেখা—এক্সরে, টেলিভিসন সিনেমা প্রভৃতি
উপকরণে	শুধু পাথর নয়—নানান ধাতু, কাঠ, প্লাসটিক ইত্যাদি হাজার রকম উপকরণ হাতের কাছে—ঘড়ি, মাজন, সেফটিপিন, গ্যাস বিজলী বাতি, জলের পাইপ, আলপিন থেকে হাওড়া ব্রীজ, আরও কত কি
কারণে অকারণে	আসলের বদলে নকল, রদ্দুরের বদলে বৃষ্টি, শীতের বদলে গরম, এখন এমন অনেক অনাসৃষ্টি কারণে অকারণে সত্যি, কলিযুগের মহিমা বিজ্ঞান। সৃষ্টির উৎসবে নিত্যনূতন শিল্প কর্মের সাফল্য। বিজ্ঞানের নিমন্ত্রণ দিকে দিকে

গ্রহের জিনিসপত্তরকে নয়, অন্য গ্রহেরও। তবে পরে তার দ্বারা সমগ্র পৃথিবীটা লাট্টু ঘোরানর মত করে আরও জোরসে ঘোরান সম্ভব হবে কিনা, তা জানা নেই। দুনিয়াটার উপর তার খবরদারি, তার মাতব্বরি, এখন রোজকার নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনাদিকালের পান্থ আমরা—অনন্ত পথে চলেছি। অণুর উত্তরায়ণ সার্থক হয়েছে মানুষের আবির্ভাবে। এখুনি শেষ কথাটির বলবার জো নেই, তার আগেই নিজেরা দেখতে দেখতে শেষ হয়ে যাব। মানুষের বুদ্ধির এত প্রতিশ্রুতি, বিশ্বজীবনের যাত্রাপথে মরণের তপস্যা হিসাবে তা কখনই শেষ হবে না ; আশা রাখা যায়, তা ভবিষ্যতে চিরঞ্জীবের সাধনা করে চলতে থাকবে। কাল নিরবধি, ক্রমবিকাশ অনির্বাণ, সময়ের সঙ্গে ভবিষ্যতে আরও বিরাট পরিণতির সম্ভাবনা সুনিশ্চিত। কিন্তু যেদিন যখন, আরও অবিশ্বাসকর সব রূপান্তর মানুষের কাজে কর্মে সাফল্যে সম্ভব হয়ে উঠবে, সেদিন 'বলিহারি এ দুনিয়াদারি' বলতে, আজকের আমরা কেউই তখন থাকব না। তাতে ক্ষতি কি? নতুন যুগে, নতুন মানুষ, নতুন চোখে পৃথিবী, দেখবে—নতুন করে বিস্মিত হবে।